POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত আমানতসমূহেও জানিয়া বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

(সূরা আনফাল: ২৮)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 23

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 6 June, 2024 28 জুল কাআদা 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.)-এর মদিনার প্রতি ভালবাসা

১৮৮৫) হযরত আনাস (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন: হে আমার আল্লাহ্! মদিনায় দ্বিগুণ বরকত দান কর, তার থেকে যা তুমি মক্কাকে দান করেছ।

১৮৮৬) হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) যখন কোনও সফর থেকে ফিরে আসতেন আর মদিনার প্রাচীর দেখতে পেতেন, তখন তিনি মদিনার প্রতি ভালবাসার টানে নিজের উটকে দ্রুত হাঁকাতেন আর যদি অন্য কোন বাহনের উপর আরোহিত থাকতেন, তবে সেটিকেও দ্রুত হাঁকাতেন।

১৮৮৭) হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে বনু সালমা গোত্র নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করে মদিনার কাছাকাছি চলে আসতে মনস্থির করে। মদিনার কোনও দিকে শূন্যস্থান থাকুক, রসুলুল্লাহ্ (সা.) তা চাইতেন না। তিনি বললেন: হে বনু সালমা! তোমরা কি পাঁয়ে হাঁটার পুণ্য চাও না? একথা শুনে তারা সেখানেই থেকে যায়।

* হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ (রহ) বলেন: ওহদের পাদদেশে দুটি গোত্র বাস করত। বনু সালমা এবং বানু হারসা। তাদের এলাকার নাম ছিল যথাক্রমে দিয়ার বনী সালমা এবং দিয়ার বনি হারসা। বনু সালমা গোত্র ইয়াসরাবের কাছাকাছি আসতে চাইছিল যাতে নামাযে অংশগ্রহণ করতে সুবিধা হয়। কিন্তু নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে আঁ হযরত (সা.) তাদের নিজেদের বসতিতেই বাস করা পছন্দ করেন।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড,কিতাব

প্রত্যেকটি হাদীসে এটাই বলা হয়েছে যে, আগমণ মাত্রই তিনি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু করবেন এবং খোদার সৃষ্টির রক্তে পৃথিবীকে রক্তরঞ্জিত করবেন। এই সকল হাদীস যারা রচনা করেছে, জানি না তারা কতটা রক্তপিপাসু এবং মানুষের প্রাণের ভুবুক্ষিত ছিল, আর সেই সময় তাদের বিবেক বুদ্ধি কতটা স্থুল ও অগভীর হয়ে পড়েছিল।

হযরত মসীহ মওউদ(আ.)-এর পবিত্র বাণী

আজ আমি কানজুল উম্মাল দেখছিলাম। মাহদী ও দাজ্জাল প্রসঙ্গে ৮৫টি হাদিস এতে একত্রিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি হাদীসে এটাই বলা হয়েছে যে, আগমণ মাত্রই তিনি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু করবেন এবং খোদার সৃষ্টির রক্তে পৃথিবীকে রক্তরঞ্জিত করবেন। এই সকল হাদীস যারা রচনা করেছে, জানি না তারা কতটা রক্তপিপাসু এবং মানুষের প্রাণের ভুবুক্ষিত ছিল, আর সেই সময় তাদের বিবেক বুদ্ধি কতটা স্থুল ও অগভীর হয়ে পড়েছিল। তারা এতটুকু বুঝে উঠতে পারেন নি যে, আবির্ভাব মাত্র 'হুজ্জত' পূর্ণ (অকাট্য যুক্তি দ্বারা পলায়নের পথ রুদ্ধ করা) না করেই অস্ত্র চালনা করা প্রেরিত পুরুষ ও তবলীগের নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আশ্চর্যের বিষয় হল, একদিকে শেষ যুগকে রসুল করীম (সা.)-এর যুগের এত বিশাল ব্যবধানে রেখেছে এবং স্পষ্টতই নবুয়তের যুগ থেকে ব্যবধান যত বেশি হবে, ততই বেশি অবহেলা, উদাসীনতা ও শিথিলতা এবং খোদা বিমুখতার ব্যধি প্রবল রূপ ধারণ করবে। তবু শেষ যুগের সংস্কারক ও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে এমন ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে যিনি আসা মাত্রই অস্ত্রের দ্বারা কাজ হাসিল করবে এবং যুক্তি প্রমাণের নামমাত্র উচ্চারণ করবে না। তিনি সংস্কারক না হয়ে একজন রক্তক্ষয়ী ও অত্যাচারী হবে।

পরিতাপের বিষয় হল, সেই হাদীসগুলি এতবেশি বিরোধাভাসপূর্ণ যে, আজগুবি কল্পকাহিনীকেও সেগুলি হার মানায়। কিন্তু এদের বোধবুদ্ধি তাদের নিজেদের বর্ণনার অসঙ্গতি উপলব্ধি করতে পারে নি।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আমি এই হাদীসগুলি পড়ে কেঁপে উঠি এবং বেদনাতুর হৃদয়ে এই চিন্তার উদ্রেক হয় যে, যদি এই সময় খোদা তা'লা, যিনি সত্য সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন, তিনি এই বিষয়টির নিষ্পত্তি না করতেন এবং এই সিলসিলা প্রতিষ্ঠিত না করতেন, তবে হাদীসের এই সমষ্টি কিছু কালের মধ্যে অসংখ্য মানুষকে ইসলাম চ্যুত করে দিত।এই হাদীসগুলি তো ইসলামের বিনাশ ও ভয়াবহ ধর্মচ্যুতির ভিত রেখেছে। এখন যেহেতু হাদীসগুলি বিফল হওয়াই ভবিতব্য ছিল, তাই এগুলিতে বর্ণিত ভিত্তিহীন ও নিষ্ফলা ভবিষ্যদ্বাণীগুলি এবং মিথ্যা কল্পকাহিনীগুলি কিছুকাল পর আগামী প্রজন্মের সামনে এমনই নিষ্ফলা হিসেবে উপস্থাপিত হলে স্পষ্টতই সংশয় দেখা দিত যে, ইসলামও অন্যান্য মিথ্যা মহাভারতীয় ধর্মের ন্যায় কেবল কাহিনী ভিত্তিক, যার না আছে মাথা আর না আছে হাত পা।

আর ভবিষ্যত প্রজন্ম হাসি-ঠাট্টা করার সুযোগ পেত আর ধৃষ্ট হয়ে বলত ,'যে ধর্ম দাজ্জালকে খোদার আসনে বসায় এবং খোদার পরিপূর্ণ গুণাবলীর বিষয়ে দাজ্জালকে অংশীদার করে, এমন ধর্মের কি কখনও সত্য ও একেশ্বরবাদী ধর্ম হওয়ার অধিকার থাকতে পারে? (মালফুযাত ,২য় খণ্ড, পৃ: ৭)

১২৯ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৪ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানা যেন সার্বিকভাবে সফল ও আশিসমণ্ডিত হয় এবং মানুষের হেদায়েতের কারণ হয়, সে জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, হে ইবনে খাত্তাব! হাজরে আসওয়াদে চুম্বন না করা পর্যন্ত কুরাইশরা ভবিষ্যতে আর কখনো আমাদের সাথে এমন আচরণের সুযোগ পাবে না।

হামরাউল আসাদ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র জীবনী এবং সম্মানীয় সাহাবাগণের নিষ্ঠা, ভালবাসা ও আত্মত্যাগের ঈমান উদ্দীপক বর্ণনা

বিশ্বের চলমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দোয়ার আহবান

আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন

অস্ট্রেলিয়ায় কর্মরত জনৈক আহমদী ফারায আহমদ তাহের সাহেবের শাহাদত বরণ, শহীদের স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব

তাঁর এই কুরবানী থেকে প্রকাশ পায় যে, তিনি মৃত্যু ভয়ে পাকিস্তান থেকে সে দেশে যান নি, বরং আহমদীদের উপর যে সব ধর্মীয় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, সেগুলির কারণে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি দেশ ত্যাগ করেছিলেন। কারণ পাকিস্তানে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নাম উচ্চারণে আহমদীদের বাধা দেওয়া হয়।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ২৬ শে এপ্রিল , ২০২৪, **এর জুমুআর খুতবা (২৬ শে শাহাদত, ১৪০৩ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, 'হামরাউল আসাদ' যুদ্ধাভিযানের কারণ এবং এর পটভূমি গত খুতবাতে বর্ণিত হয়েছিল। যাহোক, উহুদের যুদ্ধের পর শত্রুদের পথ পরিবর্তন করে মদীনায় আক্রমণের ষড়যন্ত্রের সংবাদ যখন লাভ হয় তখন মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমরকে ডাকেন আর তাদেরকে সেই মাযনি সাহাবীর কথা সম্পর্কে অবহিত করেন। তারা উভয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! চলুন শত্রুদের উদ্দেশ্যে বের হই যেন তারা আমাদের সন্তানদের ওপর আক্রমণ করতে না পারে। মহানবী (সা.) ফজরের নামায শেষ করে মানুষকে ডেকে পাঠান এবং তিনি (সা.) হযরত বেলালকে বলেন, তিনি যেন ঘোষণা দেন যে, আল্লাহ্র রসূল (সা.) তোমাদেরকে শত্রুদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর আমাদের সাথে তারাই বের হবে যারা গতকাল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ যারা উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল কেবল তারাই সাথে যাবে।

ইসলামী পতাকা এবং মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে লেখা আছে, মহানবী (সা.) নিজের পতাকা আনিয়ে নেন যা বিগত দিন থেকেই বাঁধা অবস্থায় ছিল। সেটিকে তখনও খোলা হয় নি। তিনি (সা.) এই পতাকা হযরত আলীকে দেন। অপর এক স্থানে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকরকে দিয়েছিলেন। এই উপলক্ষ্যে হযরত ইবনে উম্মে মাকতুমকে মহান বী (সা.) মদীনায় নিজের সহকারী নিযুক্ত করেছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৩০৮)

জীবনীকাররা লিখেছেন, মহানবী (সা.)-এর শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত একান্ত বিচক্ষণতাপূর্ণ ছিল। বিস্তারিত বর্ণনা য় লেখা হয়েছে যে, মুনাফিকদের মতে উহুদের যুদ্ধে ৭০জনের প্রাণহানির পর পরবর্তী দিনই অতিরিক্ত জনশক্তি না নিয়ে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে বের হওয়া চরম বিপজ্জনক কাজ ছিল। কিন্তু পরবর্তী অবস্থা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত একান্ত বিচক্ষণতাপূর্ণ ছিল, যার ফলে মুসলমানদের ব্যাপক লাভ হয়েছে। তিনি (সা.) পুরো রাত যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি বিশ্লেষণে অতিবাহিত করেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, যদি উহুদ থেকে মক্কাগামী মুশরিকরা ভাবে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের দৃঢ় অবস্থানসত্ত্বেও আমরা কোনো সুবিধা নিতে পারি নি, তখন নিশ্চিতভাবে তাদের অনুশোচনা হবে আর মাঝপথ থেকে ফিরে এসে তারা পুনরায় মদীনা আক্রমণ করবে। তাই তিনি (সা.) সর্বোত্তম রণকৌশল অবলম্বন করে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত জিহাদকারীদের মনোবল সুদৃঢ় করে। অপরদিকে মুনাফিকদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর দৃঢ়সংকল্প ও দৃঢ়বিশ্বাসের কারণে প্রতাপ সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত, শত্রুরা যখন এই সংবাদ পায় যে, ইসলামী বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে- তখন তাদের মনোবলের নিভু নিভু প্রদীপও নিভে যায়।

(গাযওয়াত ওয়া সারায়া, প্রণেতা- আল্লামা মহম্মদ আজহার ফরিদ, পৃ: ২১৫)

এটি হলো একটি জীবনীগ্রন্থের নোট।

মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইও সাথে যাওয়ার অনুমতি চায় অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অথচ উহুদের যুদ্ধে সে কেবল নিজেই ফিরে যায় নি, বরং নিজের সাথে তিনশ' সঙ্গীকেও ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এমন আচরণে নিশ্চয়ই সে অনুতপ্তও হয়ে থাকবে আর হয়ত এই কলঙ্ক মোচনের জন্য অথবা মুনাফিকদের বিষয়ে তো কোনো ভরসা নেই, হতে পারে সে অন্য কোনো ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যে যা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন, সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় আর তাঁর (সা.) সাথে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন তিনি (সা.) তাকে সাথে যেতে নিষেধ করে দেন।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৭ম খণ্ড, পৃ: ১২১]

তিনি (সা.) বলেন, যেও না! আহত সাহাবীরা, যাদের কতক উহুদের যুদ্ধে গুরুতর আহত হন- তা সত্ত্বেও তারা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পালনের কীরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন সে সম্পর্কে লেখা আছে যে, মহানবী (সা.)-এর এই ঘোষণা শোনামাত্রই, প্রেম ও নিষ্ঠায় পূর্ণ এই নিবেদিত প্রাণসাহাবীরা কোনোমতে নিজেদের আঘাত ও ক্ষতস্থান সামলে নিয়ে যার যার অস্ত্র হাতে নিয়ে পুনরায় বেরিয়ে পড়েন। মহানবী (সা.) যখন এই ঘোষণা করেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে তারা বেরিয়ে পড়েন। হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের নয়টি আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি তখন কেবল ঔষধ লাগানোর কথা ভাবছিলেন, এমন সময় তার কানে এই আওয়াজ আসে। তখন তিনি নিজের ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগানোর জন্যও অপেক্ষা করেন নি আর রওয়ানা হয়ে যান। বনু সালামা গোত্র থেকে চল্লি শজন আহত সদস্য বের হন। মহানবী (সা.) এমন অবস্থাতেও তাদেরকে নির্দেশ পালন করতে দেখে তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন আর বলেন, আল্লাহুম্মারহাম বনী সালামা। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! বনু সালামা গোত্রের প্রতি কৃপা করো। তুফায়েল বিন নু'মানের তেরোটি আঘাত লেগেছিল, খিরাশ বিন সিম্মাহ্র দশটি আঘাত লেগেছিল, কা'ব বিন মালেকের দশটির অধিক আঘাত লেগেছিল আর কুতবা বিন আমেরের নয়টি আঘাত লেগেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানরা নিজেদের অস্ত্রের সন্ধানে ছুটে যায় আর নিজেদের ক্ষতস্থানে মলম লাগানোর জন্যও অপেক্ষা করে নি। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের এই অতুলনীয় প্রেরণাকেই নিজ বাণীতে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন যেন পৃথিবীর শেষ দিবস পর্যন্ত তাদের জন্য ভালোবাসার অর্ঘ্য নিবেদিত হতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ (آل عمران:173)

(সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৩)

অর্থাৎ, যারা নিজেরা আহত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ এবং রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্য থেকে যারা অনুগ্রহ করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান।

হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, এর একটি সত্যায়নস্থল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আর হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)ও বটে।

(আসসীরাতুলর হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫০)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)-র মহানবী (সা.)-এর সাথে যাওয়ার অনুমতি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে, এই যুদ্ধে কেবল তারাই সাথে যাবে যারা উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল আর এই নির্দেশ কঠোরভাবে পালনও করা হয়। কিন্তু একজন সৌভাগ্যবান নিষ্ঠাবান সাহাবী এমন ছিলেন যিনি উহুদের যুদ্ধে যদিও অংশ গ্রহণ করেন নি তথাপি এবার তিনি সাথে যাওয়ার অনুমতি লাভ করেছিলেন। আর তিনি হলেন , হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)। ইবনে ইসহাক ও ইবনে উমর বর্ণনা করেন যে, জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর কাছে আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার ঘোষক এই ঘোষণা করেছে যে, আমাদের সাথে যেন তারাই বের হয় যারা গতকাল লড়াই অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধে উপস্থিত ছিল অথচ আমি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু আমার পিতা আমাকে আমার সাত বোনের জন্য পেছনে রেখে যান। অপর এক উক্তি অনুযায়ী তার বোনদের সংখ্যা ছিল নয়জন। যাহোক তিনি বলেন, আমার পিতা বলেন, হে আমার পুত্র! আমার এবং তোমার জন্য সমীচীন নয় যে, কোনো পুরুষ থাকবে না আর আমরা এই নারীদের (বাড়িতে) একা রেখে যাব। আমি তাদের বিষয়ে শঙ্কিতকেননা এরা যে দুর্বল নারী। আর আমি আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর সাথে জিহাদের ক্ষেত্রে তোমাকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিতে পারি না। [এটিও একটি কারণ যে, নারীদেরও পেছনে একা রেখে যেতে পারবেন না] আর জিহাদে আমি নিজে যেতে চাই। আর আমার বাসনা হলো, আমি যাবো, তুমি যাবে না। অতএব তুমি নিজের বোনদের কাছে বাড়িতে থেকে যাও। আর আমি আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর সাথে জিহাদে যাচ্ছি। তিনি বলেন, তাই আমি আমার পিতার এই নির্দেশ মানতে গিয়ে গতকাল জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারি নি, নতুবা আমারও সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল। অতএব, হযরত জাবের (রা.)-র প্রেম ও ভালোবাসাপূর্ণ এই কথা শুনে মহানবী (সা.) তাকে সঙ্গে যাবার অনুমতি প্রদান করেন। এ সম্পর্কে হযরত জাবের (রা.) গর্বের সাথে বলতেন, আমি ব্যতিরেকে তাঁর সাথে এমন কোনো ব্যক্তি যায় নি যে বিগতদিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। আর যারা বিগত দিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর সাথে যাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু মহানবী (সা.) অনুমতি দেন নি। মহানবী (সা.) এমতাবস্থায় যাত্রা করেন যখন তাঁর পবিত্র চেহারা ও কপাল ক্ষতবিক্ষত ছিল, দাঁত মোবারক ভাঙা ছিল, নীচের ঠোঁট- কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী উভয় ঠোঁ টই ভেতরের দিক থেকে ক্ষতবিক্ষত ছিল। ইবনে কামিয়ার তরবারির আঘাতে ডান কাঁধ আহত ছিল এবং উভয় হাঁটুও ক্ষতবিক্ষত ছিল। (যাত্রার প্রাক্কালে) প্রথমেই মহানবী (সা.) মসজিদে প্রবেশ করেন এবং সেখানে দুই রাকা'ত (নামায) পড়েন। লোকজন সমবেত হয়েছিল। এরপর মহানবী (সা.) তাঁর 'সাক্ব' নামক ঘোড়াটিকে মসজিদের দরজায় আনিয়ে নেন। এই যুদ্ধে শুধুমাত্র মহানবী (সা.)-এর নিকটই ঘোড়া ছিল। যাত্রার সময় মহানবী (সা.) বর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন আর কেবলমাত্র তাঁর চোখ দুটোই দৃশ্যমান ছিল। এসময়েই মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ (রা.)-র সাক্ষাৎ হয়। তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তালহা! তোমার অস্ত্র কোথায়? হযরত তালহা (রা.) নিবেদন করেন, পাশেই আছে। একথা বলেই তিনি ত্বরিত যান এবং নিজের অস্ত্র নিয়ে আসেন, অথচ সে সময় তালহা (রা.)-র কেবল বক্ষেই উহুদের যুদ্ধের নয়টি আঘাত ছিল। আর তার দেহে সর্বমোট সত্তরটিরও অধিক আঘাত ছিল। হযরত তালহা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার আঘাত অপেক্ষা মহানবী (সা.)-এর আঘাত সম্পর্কে বেশি চিন্তিত ছিলাম। মহানবী (সা.) আমার নিকট আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তুমি শত্রুদের কোথায় আছে বলে মনে করো? অর্থাৎ, আবু সুফিয়ান ও তার সৈন্যদলের অবস্থান কোথায় বলে তুমি মনে করো? আমি নিবেদন করি, নিম্নাঞ্চলে। তিনি (সা.) বলেন, আমারও একই ধারণা। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, তাদের অর্থাৎ কুরাইশের কথা যদি বলি, ভবিষ্যতে আর কখনো আমাদের বিরুদ্ধে এমন আচরণের সুযোগ তারা পাবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হাতে মক্কাকে বিজিত করেন। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, হে ইবনে খাত্তাব! হাজরে আসওয়াদে চুম্বন না করা পর্যন্ত কুরাইশরা ভবিষ্যতে আর কখনো আমাদের সাথে এমন আচরণের সুযোগ পাবে না।

সাবেত বিন সা'লাবা খাযরাজী হামরাউল আসাদ পর্য ন্ত মহানবী (সা.)-এর পথপ্রদর্শক ছিলেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে সাবেত বিন যাহাক পথ দেখিয়েছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩০৮-৩০৯)

অর্থাৎ এ সম্পর্কিত দুটি পৃথক পৃথক রেওয়ায়েত রয়েছে। মহানবী (সা.) তখন সংবাদ আনার জন্য দুজন সাহাবীকে অগ্রে প্রেরণ করেছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, মহানবী (সা.) আসলাম গোত্রের শাখা বনু সাহমের সাফইয়ান নামক ব্যক্তির দুই পুত্র সালিত ও নু'মান (রা.)-কে (কুরাইশের) গতিবিধি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য অগ্রে প্রেরণ করেন। আর এক তৃতীয় ব্যক্তিকেও প্রে রণ করেন, যে আসলাম গোত্রের শাখা বনু উয়ায়েরের সদস্য ছিল। তার নাম বর্ণিত হয় নি। তাদের মধ্য হতে দুজন হামরাউল আসাদ নামক স্থানে কুরাইশের দেখা পান। কুরাইশরা (নিজেদের মধ্যে) আলোচনা করছিল। কুরাইশরা তাদের উভয়কে দেখতে পায় এবং তাদেরকে হত্যা করে। মহানবী (সা.) যখন তাঁর সাহাবী দের সাথে রাওয়ানা দিয়ে হামরাউল আসাদ-এ পৌঁছে যাত্রাবিরতি দেন তখন এই দুজন সাহাবীকে একই কবরে সমাহিত করেন। দুই সাথির মরদেহ সেখানেই পড়ে ছিল।

এই যুদ্ধে দুজন আনসারী ভাই আহত অবস্থায় পায়ে হেঁটে যে কষ্টদায়ক সফর করেছে সেই সংক্রান্ত আনুগত্যের দৃষ্টান্তও দৃষ্টিগোচর হয়। (এর) বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আবদু ল্লাহ্ বিন সাহল এবং হযরত রাফে' বিন সাহল (রা.) নামক দুই ভাই বনু আব্দেল আশআল গোত্রের সদস্য ছিলেন। তারা দুজন উহুদের যুদ্ধ থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরে আসে। (তারা) যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন এবং হযরত আবদু ল্লাহ্ বেশি আহত ছিলেন। যখন এই উভয় ভাই মহানবী (সা.)-এর 'হামরাউল আসাদ' অভিমুখে যাওয়া এবং এতে যোগদান করা সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর আদেশ শুনতে পান তখন তাদের একজন অপরজনকে বলেন, খোদার কসম! আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর সাথে (এই) যুদ্ধে যোগদান করতে না পারি তাহলে এটি হবে অনেক বড়ো বঞ্চনা। [এরূপ ছিল তাদের ঈমান!] পুনরায় বলেন, খোদার কসম! আমাদের কাছে কোনো বাহন নেই যাতে আমরা আরোহণ করব, আর আমরা কীভাবে এই কাজ করব তা-ও জানি না। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আসো, আমরা একসাথে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হই। হযরত রাফে' (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আঘাতের কারণে আমার হাঁটার শক্তিও নেই। [এই ছিল তাদের অবস্থা।] তার ভাই তাকে বলেন, আসো, আমরা ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করি এবং মহানবী (সা.)-এর দিকে অগ্রসর হতে থাকি। অতএব, তারা দুজন টেনে-হিঁচড়ে হাঁটতে থাকেন। হযরত রাফে' (রা.) যখন দুর্বলতা অনুভব করেন তখন হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) তাকে নিজের পিঠে তুলে নিতেন। আবার কখনো তিনি হাঁটতেন। তারা দুজনই আহত ছিলেন, কিন্তু যিনি কিছুটা ভালো ছিলেন তিনি বেশি আহতকে নিজের পিঠে তুলে নিতেন। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। দুর্বলতার কারণে কখনো কখনো অবস্থা এমন হতো যে, তারা নড়াচড়াও করতে পারতেন না। এভাবে তারা দুজন এশার সময় মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। সাহাবীরা তখন আগুন প্রজ্জ্বলিত করছিলেন। অর্থাৎ ততক্ষণে তারা শিবির স্থাপন করেছিলেন। তাদের উভয়কে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করা হয়। সেই রাতে মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার দায়িত্বে হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.) নিযুক্ত ছিলেন। তাদের পৌঁছানোর পর মহানবী (সা.) তাদের দুজনকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের পথে কী বাধ সেধেছে? (অর্থাৎ তোমাদের বিলম্বে আসার কারণ কী?)। তারা উভয়ে তাদের বিলম্বে আসার কারণ সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তখন মহানবী (সা.) তাদের দুজনের মঙ্গল কামনা করে বলেন, "তোমরা দুজন যদি দীর্ঘায়ু লাভ করো তাহলে বাহন হিসেবে ঘোড়া, খচ্চর এবং উট তোমাদের হস্তগত হবে। [এখন তো তোমরা কষ্টেসৃষ্টে কোনোমতে পায়ে হেঁটে এসেছ, কিন্তু দীর্ঘায়ু লাভ করলে তোমরা এসব কিছু স্বচক্ষে দেখবে; এসব বাহন তোমরা লাভ করবে।] কিন্তু তোমাদের দুজনের জন্য এই সফরের চেয়ে তা উত্তম হবে না যা কোনোমতে তোমরা পায়ে হেঁটে করেছ। [একথাও সাথেবলে দিয়েছেন। অর্থাৎ, তোমাদের এই সফরের প্রতিদান এত বেশি যে, সেই যুগের সর্বোত্তম নিয়ামতরাজির চেয়েও এটি বেশি।] এটিও বলা হয় যে, এই ঘটনা ফযালার পুত্র হযরত আনাস ও হযরত মু'নেস (রা.)-র সাথে ঘটেছিল। হয়ত এই ঘটনা উভয়ের সাথেই ঘটে থাকবে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১০)

এরপর মুসলমানদের পাথেয় এবং হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)র বদান্যতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হামরাউল আসাদের যুদ্ধে আমাদের সাধারণ পাথেয় ছিল খেজুর, (অর্থাৎ,) আমরা শুধু খেজুরই খেতাম। হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) ত্রিশটি উট এবং খেজুর নিয়ে আসেন যা হামরাউল আসাদে অবস্থান পর্যন্ত আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। বর্ণনাকারী একথাও লিখেছেন, তিনি উট নিয়ে এসেছিলেন, যা হতে কোনোদিন দুটি আবার কোনোদিন তিনটি করে জবাই করা হতো। মাঝে মাঝে খেজুরের সাথে উটের মাংস ও খাওয়া হতো।

মহানবী (সা.)-এর রণকৌশল কী ছিল আর কীভাবে তিনি শত্রুদের সন্ত্রস্ত করতে চাইতেন- এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ হলো,শত্রুদের হৃদয়ে ত্রাস সঞ্চার এবং তাদের ভীতসন্ত্রস্ত করার একটি পদ্ধতি এটি ছিল যে, রাতের বেলা বহুল পরিমাণে আগুন জ্বালানো হতো যেন এর ফলে সৈন্যদের আধিক্য বোঝা যায় ও শত্রুরা ভীত হয়। এ কারণে মহানবী (সা.) যেখানেই রাতের বেলা তাঁবু গাড়তেন, সাহাবীদের নির্দেশ দিতেন যে, ছড়িয়ে গিয়ে পৃথক পৃথক আগুন জ্বালাবে। সে অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তি এক এক স্থানে আগুন জ্বালাতো। পাঁচশ জায়গায় আগুন জ্বালানো হয়, এমনকি তা বহুদূর থেকে দৃষ্টিগোচর হতো। মুসলমান বাহিনী এবং এই আগুন প্রজ্জ্বলিত করার সংবাদ বহুদূর পর্য ন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত করেছেন।উল্লেখ করা হয় যে, সে সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে মা'বাদ খু যাঈ-র সাক্ষাৎ হয় আর তারপর সে আবু সুফিয়ানের কাছেও যায় এবং মুসলমান সৈন্যবাহিনীর বিষয়ে কুরাইশকে ভয় দেখায়। এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মা'বাদ বিন আবু মা'বাদ খু যাঈ মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে। সে তখনো মুশরিক ছিল। কতক জীবনীকার এ সময়ে তার ইসলাম গ্রহণের কথাও উল্লেখ করে, কিন্তু অধিকাংশই এটি বলে যে, সেসময় সে ইসলাম গ্রহণ করে নি, যদিও পরবর্তীতে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

বনু খুযাআ গোত্রের মুসলমান ও মুশরিকরা মহানবী (সা.)-এর সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণ করত; এই গোত্রের মানুষের অনেকেই মুসলমান হয়েছিল, তাদের মাঝেও নিষ্ঠা ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল যে, তারা তাঁর (সা.) নিকট কিছু গোপন করবে না। মা'বাদ বলল, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি এবং আপনার সাহাবীরা যে কষ্ট পেয়েছেন তা আমাদের ব্যথিত করেছে। আমাদের এটিই আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহ্ তা'লা আপনার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং আপনাকে সকল কষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন। এই সহানুভূতি প্রদর্শনের পর মহানবী (সা.) মা'বাদকে বলেন, আবু সুফিয়ানের মনোবল ভেঙে দাও। তুমি যেহেতু যাচ্ছো তাই তার সাথে সাক্ষাৎ করো আর তাকে একটু ভয় দেখাও। দেখুন! কীভাবে তিনি প্রজ্ঞাপূর্ণ পরিকল্পনা করেছেন। অতঃপর মা'বাদ সেখান থেকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং মহানবী (সা.) হামরাউল আসাদে অবস্থান করেন। রাওয়াহা নামক স্থানে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীসাথিদের সাথে তার দেখা হয়। রাওয়াহা মদীনা থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। সে সময় কুরাইশ সৈন্যবাহিনী মহানবী (সা.) তথা মুসলমানদের ওপর হামলা করার বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছে। তারা বলে, আমরা তাদের সর্বোত্তম লোক এবং সর্দার ও নেতৃস্থানীয় লোকদের হত্যা করেছি! [যদিও প্রকৃত বিষয় এমন ছিল না। হযরত হামযাসহ কয়েকটি নাম হতে পারে, অন্যথায় মহানবী (সা.)সহ হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-র সাথে ডজন ডজন বিখ্যাত সর্দার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা খোদা তা'লার ফযলে উহুদের যুদ্ধে সুরক্ষিত ও নিরাপদ ছিলেন।]অতঃপর বলে, আমরা তাদের নির্মূল করার পূর্বে ই ফিরে এসেছি। এখন আমরা তাদের অবশিষ্ট লোকদের ওপর ফিরে গিয়ে হামলা করব, তাদেরকে ধ্বংস করব এবং কাজ শেষকরব। আবু সুফিয়ান যখন মা'বাদকে দেখে তখন বলে, এ যে মা'বদ! তার কাছে কোনো সংবাদ থাকবে নিশ্চয়। সে বলল, মা'বাদ! পেছনের (অর্থাৎ মদীনার) অবস্থা কী? সে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ানকে বলে, আমি দেখেছি, মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাথিরাবিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বের হয়েছে। আমি আজ পর্যন্ত এত সৈন্য কখনো দেখি নি। অওস এবং খাযরাজ-এর যে-সব মানুষ গতকাল পিছিয়ে ছিল তারাও তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে। [সে নিজের পক্ষ থেকেও কিছুটা বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে।] আর তারা অঙ্গীকার করেছে যে, তারা তোমাদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে আর ফেরত যাবে না। তারা নিজের জাতির কারণে প্রচণ্ড রাগান্বিত। নিজেদের এহেন কর্মের কারণে লজ্জিত যে, কেন তারা পূর্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তাদের মাঝে তোমাদের বিরুদ্ধে এত প্রচণ্ড ক্রোধ রয়েছে যেমন ক্রোধ আমি কখনো দেখি নি। আবু সুফিয়ান বলে, তুমি ধ্বংস হও! তুমি কী বলছ? সে বলে, মনে হয় তুমি ঘোড়াগুলোকে দেখার আগ পর্যন্ত এখান থেকে সরবে না। [এটিও তাদের বাগ্‌ধারা যে, প্রত্যাবর্তনটা যেন ধ্বংসাত্মক না হয়।] আবু সু ফিয়ান বলে, খোদার কসম! আমরা তাদের ওপর বিজয়ী হয়ে তাদের মূলোৎপাটন করার বিষয়ে সহমত হয়েছি। মা'বাদ বলে, আমি পুনরায় তোমাকে এ কাজ থেকে বাধা দিচ্ছি, কেননা যে ভয়ানক দৃশ্য আমি দেখেছি তা আমাকে কবিতা পড়তে বাধ্য করছে। আবু সুফিয়ান বলল, কী সেই কবিতা? মা'বাদ এরপর এই পঙ্‌ক্তিগুলো পড়ে শোনায়:

كَادَتْ تُهَدُّ مِنَ الْأَصْوَاتِ رَاحِلَتِي إِذْ سَالَتِ الْأَرْضُ بِالْجُرْدِ الْأَبَابِيلِ
تَرْدِي بِأُسْدٍ كِرَامٍ لَا تَنَابِلَةٍ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَلَا مِيلٍ مَعَازِيلِ فَظَلْتُ
عَدْوًا أَظُنُّ الْأَرْضَ مَائِلَةً لَمَّا سَمَوْا بِرَئِيسٍ غَيْرِ مَخْذُولِ فَقُلْتُ وَيْلَ
ابْنِ حَرْبٍ مِنْ لِقَائِكُمْ إِذَا تَغَطْمَطَتِ الْبَطْحَاءُ بِالْجِيلِ إِنِّي نَذِيرٌ لِأَهْلِ
الْبَسْلِ ضَاحِيَةً لِكُلِّ ذِي إِرْبَةٍ مِنْهُمْ وَمَعْقُولِ مِنْ جَيْشِ أَحْمَدَ لَا
وَخَشٍ تَنَابِلَةٍ وَلَيْسَ يُوصَفُ مَا أَنْذَرْتُ بِالْقِيلِ

যখন ভূপৃষ্ঠে উন্নত প্রজাতির ঘোড়া দলে দলে ছুটতে লাগল তখন সেগুলোর পদধ্বনি শুনে আমার উটনী ভয়ে দিগ্বিদিক ছোটার এবং ভূপাতিত হওয়ার উপক্রম হলো। [দেখুন! সেখানে শুধু একটি ঘোড়া ছিল, কিন্তু সে নিজের পঙ্‌ক্তিতে এমন অতিরঞ্জিত চিত্র অঙ্কন করে যার ফলে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এরপর বলে,] সেই ঘোড়াগুলো এরূপ শক্তিশালী বাঘের ন্যায় সাহসী যোদ্ধাদের বহন করছিল যারা খর্বকায়ও নয় আর যুদ্ধের সময় নিরস্ত্রও নয় কিংবা অশ্বপরিচালনায় অদক্ষও নয়।[অর্থাৎ যুদ্ধে অত্যন্ত পারদর্শী, তির তরবারিতে সুসজ্জিত এবং অশ্বারোহণের দক্ষতায় যুগে অনন্য।] তখন আমি সংবাদ প্রদানের জন্য দ্রুত ছুটলাম।আমার মনে হচ্ছিল যেন সেই ঘোড়াগুলোর সম্মুখে পৃথিবী বিনম্র শ্রদ্ধায় ঝুঁকে যাচ্ছে- যাদের পিঠে সেই মহান সেনাপতি বসে ছিল যিনি একা নয়, অর্থাৎ সৈন্যসামন্তসহ ধেয়ে আসছে। আর আমি মনে মনে বললাম, হে সৈন্যদল! তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইবনে হারব অর্থাৎ আবু সুফিয়ানের ধ্বংস নিহিত।যখন সৈন্যদলের পদশব্দে রণক্ষেত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে তখন আমি কুরাইশের মধ্য থেকে প্রত্যেক বিচক্ষণ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে আহমদ (সা.)-এর বিশাল এ সৈন্যদল সম্পর্কে সতর্ক করবযার সৈন্যদল অকর্মা এবং নিম্নশ্রেণির লোকজন দ্বারা গঠিত নয়।এ সৈন্যদলের ত্রাস যা সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করছি, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

মা'বাদের এই স্নায়ুবিধ্বংসী কথাবার্তা এবং এই পঙ্‌ক্তিগুলো শোনার পর সাফওয়ান বিন উমাইয়ার সাথে আলোচনার ফলে আবু সুফিয়ান এবং তার সাথিদের মনোবল হারিয়ে যায়।আর তাদের হৃদয়ে ভীতি ও ত্রাস ছেয়ে যায়। তখন আবু সুফিয়ান যত দ্রুত সম্ভব নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কায় ফেরত চলে যাওয়াকেই নিরাপদ জ্ঞান করল।

এ সম্পর্কে রিসার্চ সেল -এর পক্ষ থেকে একটি নোটও রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর মা'বাদকে একথা বলা যে, আবু সুফিয়ানের মনোবল ভেঙ্গে দাও- সীরাতের অনেক পুস্তক এটি বর্ণনা করেছে, আবার অনেকে এটি বর্ণনা করে নি। বলা হয়ে থাকে, যুদ্ধকৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে হয়ত মহানবী (সা.) মা'বাদ-এর সাথে এরূপ কথা বলে থাকবেন; আবারহতে পারে, মহানবী (সা.) তাকে কিছুই বলেন নি, আর একথার সম্ভাবনাই বেশি। সে যেহেতু মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি রাখতো তাই হতে পারে, আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে এই প্রেরণা সঞ্চার করে থাকবেন। আর সে নিজের পক্ষ থেকেই এ সকল কথাবার্তা বানিয়ে আবু সুফিয়ান কে বলে থাকবে।

যাহোক, এটা তাদের নোট। কিন্তু মা'বাদ যা কিছুই বলেছিল- তা ছিল একান্ত তার ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা। মহানবী (সা.) তাকে অবাস্তব বা অলীক কোনো কথা বলেন নি। কিন্তু যেভাবে সে তাদেরকে ভয় দেখিয়েছিল আর মুসলমানদের যে চিত্র সে অঙ্কন করেছিল- এই চিত্রের কথা শুনে কাফিররা নিঃসন্দেহে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে মুশরিকদের সৈন্যদল মক্কায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এমন সময় আবু সুফিয়ানের পাশ ঘেঁষে আব্দুল কায়েসের একটি কাফেলা অতিক্রম করে যারা মূলত সেখানেই শিবির স্থাপন করেছিল। সে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছ? তারা বলে, আমরা মদীনা যাচ্ছি। তখন আবু সুফিয়ান অপপ্র চার হিসেবে তার পক্ষ থেকে একটি ব্যর্থ মনস্তাত্ত্বি ক আক্রমণ করার দূরভিসন্ধি করে। সে বলে যে, তুমি কি আমার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছে দিবে? আমি তোমায় উকাযের মেলায় কিসমিস বোঝাই করা একটি উট দিবো। সে বলে, হঁ্যা, নিশ্চয়ই! আবু সুফিয়ান বলে, যখন তুমি মু হাম্মদ (সা.)-এর সাথে দেখা করবে তখন তাকে বলবে, আমরা তঁ ার ও তঁ ার সাহাবীদের দিকে আসার বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেছি যেন তাঁদের বাকি

লোকদের আমরা সমূলে উৎপাটন করতে পারি আর আমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবনে আছি। এ কথা বলে আবু সুফিয়ান মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। মহানবী (সা.)-এর সাথে এই কাফেলার হামরাউল আসাদে দেখা হয়। আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীসাথিরা তাঁর সম্পর্কে যা বলেছিল- আব্দুল কায়েস মহানবী (সা.)-কে তা অবহিত করে। এই কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল অর্থাৎ আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট; তিনি সর্বোত্তম কার্যনির্বাহক।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড , পৃ: ৩১০-৩১১)

যাহোক, হামরাউল আসাদে স্বল্পকাল অবস্থানের পর ইসলামী সৈন্যবাহিনী মদীনায় ফেরত আসে কেননা কাফিররা সেখান থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, মা'বাদ খুযাঈর কথা শুনে আবু সুফিয়ান মদীনার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়ার ধারণা পরিত্যাগ করে এবং মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। আবু সুফিয়ানের রওয়ানা হবার সংবাদ মা'বাদ অন্য এক ব্যক্তির মাধ্যমে রসূল (সা.)-এর নিকট পোঁছে দিয়েছিল। মহানবী (সা.) সোম, মঙ্গল ও বুধবার সেখানে অবস্থান করেন। এরপর হুযূর (সা.) মদীনায় ফিরে আসেন। বালাযুরী বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) সফরে মদীনা থেকে পাঁচ দিন বাইরে ছিলেন।

(আমতাউল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮০-১৮১) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড , পৃ: ৩১২)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, মহানবী (সা.) জুমুআর দিন মদীনায় ফেরত আসেন এবং পাঁচ দিন তিনি মদীনার বাইরে ছিলেন।

(কিতাবুল মাগাযি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৪)

হযরত আবু উবাইদা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে মুয়াবিয়া বিন মুগীরাকে আটক করে রেখেছিলেন। মুয়াবিয়া বিন মুগীরা, আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের নানা ছিল। মুয়াবিয়া ছাড়াও আবু আয্যা জামহুনিকেও গ্রেফতার করে রেখেছিলেন। মুয়াবিয়া বিন মুগীরা সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) ও হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) মুয়াবিয়াকে হামরাউল আসাদ থেকে ফেরত আসার সময় হত্যা করেছিলেন, কারণ মুয়াবিয়া মদীনায় গোপনে বসবাস করছিল এবং মদীনার সংবাদ বিরুদ্ধবাদীদের নিকট পাঠাতো। যখন সে ধরা পড়ে তখন হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে আশ্রয় নেয়। হযরত উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট তার প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন। মহানবী (সা.) তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার সময় বলেন, সে যেন তিন দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যায়। যদি তিন দিনের পরে তাকে মদীনায় দেখা যায় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু সে তিন দিন পরেও লুকিয়ে মদীনায় অবস্থান করে। মহানবী (সা.) এই দুজনকে অর্থাৎ হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) ও হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে বলেন, তোমরা অমুক জায়গায় তাকে লুকানো অবস্থায় পাবে। অতএব তারা উভয়ই তাকে সেখানে গিয়েই ধরে ফেলেন এবং হত্যা করেন।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৫৪৮)

এরপর বর্ণিত হয়েছে, এই হামরাউল আসাদেই মহানবী (সা.) মুশরিকদের কবি আবু আয্যাকে আটক করেন। এ হলো সেই আবু আয্যা যে বদরের যুদ্ধের সময় মুসলমানদের হাতে আটক হয়েছিল আর মহানবী (সা.)-কে সে নিজের দারিদ্রতা এবং নিজের মেয়েদের দোহাই দিয়েছিল যে, আমার পরিবার-পরিজনের সংখ্যা অনেক, আমার মেয়েদের কোনো অভিভাবক নেই; আমার প্রতি দয়া করুন। মহানবী (সা.) তার মেয়েদের দিকে তাকিয়ে কোনোরূপ ফিদিয়া (তথা মুক্তিপণ) গ্রহণ করা ছাড়াই তাকে অনুগ্রহবশে মুক্তি দেন আর তার কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আগামীতে সে কখনো মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে না এবং মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে সৈন্যসমাবেশ করবে না কিংবাকাউকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে উস্কানিও দেবে না। সে তার উক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আর উহুদের যুদ্ধে কুরাইশের সাথে মিলে যুদ্ধ করতে আসে। সে লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করত আর নিজের কবিতার মাধ্যমে মানুষজনকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করত। মহানবী (সা.) দোয়া করেন যে, এবার যেন এই ব্যক্তি বেঁচে ফিরতে না পারে। ফলে সে পুনরায় আটক হয়। এক ভাষ্য অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পর মুশরিকরা যখন প্রত্যাবর্তনকালে হামরাউল আসাদে গিয়ে শিবির স্থাপন করে তখন তারা আবু আয্যাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে যায়। সে সূর্যোদয়ের পরও কুম্ভকুর্ণের মতো নিদ্রামগ্ন থাকে। তাকে গ্রেফতারকারী ব্যক্তি ছিলেন হযরত আসেম বিন সাবেত। সে ছিল উক্ত যুদ্ধে আটক হওয়া একমাত্র মুশরিক। অপর এক বর্ণনামতে তাকে গ্রেফতারকারী সাহাবী ছিলেন হযরত উমায়ের বিন আব্দুল্লাহ্। গ্রেফতার হওয়ার পর আবু আয্যাকে মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত করা হয়। মহানবী (সা.)-কে দেখে সে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমাকে ছেড়ে দিন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমার কন্যাদের দিকে তাকিয়ে আমাকে মুক্তি দিন।আমি আপনার সামনে অঙ্গীকার করছি- আগামীতে কখনো এ ধরনের কাজ আর করব না। তিনি (সা.) বলেন, না! আল্লাহ্র শপথ! আর কখনো তোমার এই মুখ নিয়ে মক্কা দেখার সৌভাগ্য হবে না। এক রেওয়ায়েতে আছে, [তিনি (সা.) বলেছিলেন] আগামীতে তুমি কখনো আর তোমার এই দাড়ি নিয়ে হাজরে আসওয়াদের পাশে বসে একথা বলার সুযোগ পাবে না যে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে বোকা বানিয়ে এসেছি। এরপর তিনি (সা.) হযরত যায়েদের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দেন যে, এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করো। এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি (সা.) হযরত আসেম বিন সাবেত (রা.)-কে (মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার) এই নির্দে শ দিয়েছিলেন এবং এরপর বলেছিলেন, মু'মিন কখনো এক গর্তে দুবার দংশিত হতে পারে না।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫২)

অবশিষ্টাংশ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে। বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা প্র ত্যেক আহমদীকে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।এখন আমি মুকাররম ফারায আহমদ তাহের সাহেবের (গায়েবানা) জানাযাও পড়াবযিনি অস্ট্রেলিয়াতে সম্প্রতি শাহাদত বরণ করেছেন। তার ঘটনার বিবরণে লেখা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার সিডনীর বিখ্যাত এলাকা ব ন্ডি'র এক বিপণিবিতানে একজন অস্ট্রেলীয় ব্যক্তিছুরিকাঘাত করে তাকে শহীদ করে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

মরহুম বিপণিবিতানে নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। মরহুমের বয়স হয়েছিল ৩০ বছর এবং তিনি অবিবাহিত ছিলেন। এই আক্রমণে বারোজন ব্যক্তি আহত হন যাদের মধ্যে ছয়জন মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুবরণকারী ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন ভদ্রমহিলা।

প্রয়াত ফারায আহমদ তাহের সাহেব রাবওয়ার অধিবাসী ছিলেন। ২০১৮ সালে তিনি পাকিস্তান থেকে শ্রীলঙ্কা চলে যান। চার বছর তিনি সেখানে অবস্থান করেন, এরপর গত বছর UNHCR- এর মাধ্যমে অস্ট্রে লিয়ায় আসেন। গত মাসে মরহুম তার সিকিউরিটি লাইসেন্স বানিয়েছিলেন আর যে-দিন মরহুমের মৃত্যু হয় সেদিন বিপণিবিতানে (তার নামে) প্রথমবারের মতো দিনের বেলা ডিউটি লেখা হয়েছে। তিনি মূলত রাতে ডিউটি দিতেন, তবে এটি তার দিনের বেলা ডিউটির প্রথম দিন ছিল।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো, মুকাররম মরহুম ফারায আহমদ তাহের সাহেব মানুষজনকে হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করতে দেখে ঘাতককে বাধা দিতে সম্মুখে অগ্রসর হন। তখন ঘাতক মরহুমের ওপর আক্রমণ করে, যার ফলে তিনি প্রাণ হারান। এ আক্রমণে মৃত্যু বরণকারী তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি। মরহুমের পরিবারে তার প্রপিতামহ মুকাররম মিয়া আহমদ সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত আসে যিনি শাহ্পুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। মরহুমের দাদা মুকাররম সূফী আহমদ ইয়ার সাহেব দীর্ঘদিন যাবৎ জামা'তের কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। তার পিতা বশীর আহমদ সাহেব ২০০৫ ইং সনে এবং তার মা রাজিয়া বেগম ২০১৪ সনে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। মরহুম তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিন ভাই, দু ই বোন ও দাদা সূফী আহমদ ইয়ার সাহেবকে রেখে গেছেন। বিস্তারিত বিবরণে তার সম্পর্কে এটিও জানা গেছে যে, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর প্রিমিয়ার মরহুম ফারায আহমদ তাহের সাহেবের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন। অনুরূপভাবে অস্ট্রেলিয়াতে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাই কমিশনার সাহেবও মরহুম ফারায আহমদ তাহের সাহেবের বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে শোক প্রকাশ করেন এবং সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। এ ঘটনা সম্পর্কে মিডিয়াতে একশ কুড়িটির অধিক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং আরো হচ্ছে। আজ সেখানে (অস্ট্রেলিয়ায়) তার জানাযা ছিল। সেখানেও স্থানীয় প্রিমিয়ার, প্রধানমন্ত্রী প্রমুখ এসেছিলেন। তারা পুনরায় তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মরহুম ফারায তাহের সাহেবের বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে অত্যন্ত চমৎকার ভাষায় বর্ণনা করা হচ্ছে এবং অধিকাংশ মানুষ তাকে ন্যাশনাল হিরো বা জাতীয় বীর বলে আখ্যায়িত করছেন। তার এ আত্মত্যাগ প্রমাণ করে যে, তিনি পাকিস্তান থেকে মৃত্যুভয়ে পালিয়ে আসেন নি। বরং যেসব ধর্মীয় বিধিনিষেধ আহমদীদের ওপর আরোপ করা হয় সেগুলোর কারণে অতিষ্ঠ হয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন যেখানে তাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নাম উচ্চারণে বাধা দেওয়া হতো। খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর আদনান কাদের বলেন, ২১ এপ্রিল রোজ রবিবার অস্ট্রেলিয়া সরকারের পক্ষ থেকে শপিং মলের কাছে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল ঐসব ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন যারা উক্ত ঘটনায় নিহত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ার প্র ধানমন্ত্রী, নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রি মিয়ার, বিরোধী দলীয় নেতা, স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং অন্যান্য কাউন্সিলের

মেয়রগণ, পুলিশ, সেনা ও নৌবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বিপুল সংখ্যক সংবাদকর্মী ও অন্য বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মকর্তাগণও অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে জামা'তের সদস্যদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়।

তার বড়ো ভাই মুদাস্‌সের বশীর বলেন, মরহুম শৈশব থেকেই খুব পরিশ্রমী, হাস্যবদন ও নির্ভীক বালক ছিলেন। মরহুমের এগারো বছর বয়সে আমাদের পিতা মৃত্যু বরণ করেন। তখন আমাদের বড়ো ভাই মুযাফ্ফর আহমদ সাহেব আমাদেরকে পিতৃস্নেহে লালনপালন করেন। মরহুম নিজ পড়াশুনার পাশাপাশি ভাইয়ের ব্যবসায়ও সাহায্য করতেন। মরহুম কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন আর নিজের ভাইবোনদের খুব ভালোবাসতেন। নম্র স্বভাবেরঅধিকারী ছিলেন আর প্র কৃতিতে রসিকতাও ছিল। ভাইবোনদের কোনো কথায় কখনো রাগান্বিত হন নি। জামা'তের কাজেও মরহুম বেশি বেশি অংশগ্রহণ করতেন। যতদিন পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়া তথা যেখানেই ছিলেন জামা'তের কাজ ও ডিউটি ইত্যাদি পালনে সর্বদা তৎপর ছিলেন। খিলাফতের সাথে গভীর নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তার একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, যদি নাগরিকত্ব পাই তাহলে প্রথমে লন্ডনে গিয়ে খলীফাতুল মসীহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করব। তার ছোটো ভাই সিরাজ আহমদ বলেন, মরহুম খুবই সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করতেন এবং নিয়মিত নামায আদায় করতেন। মুরব্বী কামরান মুবাশ্বের সাহেব বলেন, আমি মরহুমের মধ্যে একটি গুণ দেখেছি যে,জামা'তের মুরব্বী ও বুযুর্গদের খুবই সম্মান করতেন। আর তাদের পক্ষ থেকে যে নির্দেশনাই প্রদান করা হতো তা পালনে অস্বীকার করতেন না। তার কোনো ভুলভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে কখনো মন খারাপ করতেন না, বরং বিনয়ের সাথে নীরবে নিজের ভুল স্বীকার করে নিজের সংশোধন করতেন।

তার এক বন্ধু আহমদ ইবরাহীম বলেন, মরহুম ধর্ম এবং খিলাফতের প্রতি অতুলনীয় অনুরাগী সত্তা ছিলেন। জামা'তের কর্ম কর্তাদের প্র তি শ্রদ্ধাশীল ও নিয়মিত নামায আদায়কারী ছিলেন। তার সাথে আমার এক ভাই এবং বন্ধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কখনো কোনোবিষয়ে আমি বকাঝকা করলে অবনত নয়নে শুনতেন আর বলতেন, ভবিষ্যতে (এই বিষয়ে) অভিযোগ-অনুযোগের (কোনো) সুযোগ দেবো না। খুবই হাস্যোজ্জ্বল এবং স্নেহশীল মানুষ ছিলেন।

ব্রিসবেন জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, গত মার্চ মাসে সপ্তাহ খানেকের জন্য ব্রিসবেন এসেছিলেন। বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছেন বলে জানান এবং সাথে এটিও বলেন, কেউ যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় বা কারো যদি কোনো অভিযোগ থাকে সেজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থনা ও মীমাংসা করতে এসেছি। বারবার সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছিলেন। এমন মনে হচ্ছিল, হয়ত সবাইকে 'খোদা হাফেয' বলার জন্য এসেছেন।

তার এক বন্ধু শাজার আহমদ বলেন, '(তিনি) একজন পরিশ্রমী, নির্ভীক এবং দায়িত্বশীল মানুষ ছিলেন।' মরহুমের সাথে আহত অপর এক নিরাপত্তারক্ষী বলেন, হামলাকারী শপিং সেন্টারে প্রবেশ করতেই লোকেরা তাকে দেখে পালাচ্ছিল, তখন মরহুম বীরত্ব প্রদর্শন করে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং নিজের প্রাণের বিনিময়ে অন্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও মানুষ ফারায তাহের সাহেবের ভূয়সী প্রশংসা করছে।

ক্রিস মারফি নামক এক ব্যক্তি তার কমেন্টে লিখেন, আক্রমণের পূর্বে আমি পরিপাটি পোশাকপরিহিত একজন নিরাপত্তারক্ষী ফারায তাহেরকে দেখেছি, যিনি শপিং সেন্টারে নিজের কর্তব্য পালনে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি একজন বীর ছিলেন, যিনি জনসাধারণের জীবন রক্ষার্থে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

রেবেকা আইবার্স নামের একজন ভদ্রমহিলা লিখেন, 'ফারায তাহের, যিনি নিজেরদেশে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিরাপদ ও এক সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলেন, তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের মাঝে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন, তিনি মানুষের জীবন রক্ষার্থে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। আমি তার পরিবার এবং জামা'তের প্র তি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এক দুর্ঘটনা।' যারা শপিং মল-এ দেখেছেনএবং যারা সংবাদ পাঠ করেছেন তারা ও অন্যরা এধরনের আরো অনেক মন্তব্য করেছেন। জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার শিক্ষার্থী স্নেহের হাসূর আহমদ বলেন, ফারায তাহের আমার জ্যাঠাতো ভাই ছিলেন। (তিনি) উত্তম ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। পাঁচবেলার নামায নিষ্ঠার সাথে আদায়কারী ছিলেন এবং এ বিষয়ে অন্যদের উপদেশ প্রদান করতেন। যখনই সাক্ষাৎকরতেন হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করতেন। আমাকে আপন ছোটো ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখতেন। কোনো কথা বুঝাতে হলে খুবই স্নেহের সাথে বুঝাতেন। সর্বদা দোয়ার জন্য বলতেন, আমি আপনাদের জন্য দোয়া করব আপনারা আমার জন্য দোয়া করুন। তিনি বলেন, যেদিন তার শাহাদত হয় সেদিন শেষবার তার ফোন আসে আর তখন অস্ট্রেলিয়াতে ভোর ৪টা বাজছিল। তার বড়ো ভাই তাকে বলেন, এখন ভোর ৪টা বাজে, তোমাকে কাজে যেতে হবে, (তাই) তুমি ঘুমিয়ে পড়। তিনি (ফারায তাহের) বলেন, আমি এখন তাহাজ্জুদ পড়েছি আর আপনাদের সবার জন্য দোয়াও করেছি। এরপর ফজরের নামায পড়ে কর্ম স্থলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাব, ঘুমানোর সময় নাই। সকালের শিফটের এটাই প্রথম দিন ছিল। এর পূর্বে সন্ধ্যার শিফটে (দায়িত্ব পালন) করতেন। অতঃপর তিনি লিখেন, আমাদের বংশে এটি তৃতীয় শাহাদাত। প্রথমে আমার খালু মুহাম্মদ নওয়াজ সাহেব, আওরাঙ্গী টাউন, করাচিতে ১১ইসেপ্টেম্বর, ২০১২ সালে শহীদ হন, তারপর তার মামা এজায আহমদ, আওরাঙ্গী টাউন, করাচিতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০১৩ সালে শহীদ হন আর এখন ফারায আহমদ সাহেবের শাহাদত হয়।

যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছিলাম, তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'আমি মৃত্যুভয়ে দেশত্যাগ করি নি বরং ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে এসেছি।' আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং পরিবারবর্গকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন, আমীন।

****

২য় খুতবার শেষাংশ....

তরবিয়ত ও আত্মশোংসধনের কাজ আরম্ভ করে দেন। কিন্তু তিনি (সা.) এ কাজ সহজভাবে করতে পারেন নি। উহুদের যুদ্ধের পর ইহুদীদের সাহস আরো বেড়ে যায় এবং মুনাফিকরাও আরো বেশি মাথাচাড়া দিতে থাকে। আর ধরে নেয় যে মানুষের পক্ষে ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব। সুতরাং ইহুদীরা তাঁকে (সা.) কষ্ট দিতে শুরু করে যেমন মহানবী (সা.) ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্য করে, নোংরা কবিতা লিখে তাদের অসম্মান করা হতো। একবার একটি বিবাদ মেটানোর জন্য তাঁকে (সা.) ইহুদীদের দুর্গে যেতে হয়। তারা মহানবী (সা.) যেখানে বসে ছিলেন এর ওপর থেকে একটি (বড়ো) পা থর ফেলে তাকে (সা.) শহীদ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু আল্লাহ তা'লা যথাসময়ে তাঁকে (সা.) জানিয়ে দেন এবং তিনি (সা.) কিছু না বলেই সেখান থেকে চলে আসেন। পরবর্তীতে ইহুদীরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নেয়।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৫৭)

উহুদের যুদ্ধের পরপরই সংঘটিত 'হামরাউল আসাদ' যুদ্ধের বর্ণনা এখানে শেষ হচ্ছে। পৃথিবী, মুসলমান ও ফিলিস্তিনিদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি দোয়ার আহ্বান করে থাকি। যদিও কিছু লোক মনে করে যে, কিছুসময়ের জন্য যুদ্ধবিরতি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বিরাজমান অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয়, যুদ্ধবিরতি হলেও ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্যাতন শেষ হবে না। এজন্য অনেক দোয়ার প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা, ফিলিস্তিনিদের তাঁর দিকে বিনত হওয়ার তৌফিক দিন।

যাইহোক, এ অবস্থা অহংকারীদের দম্ভ চুরমার করার উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এখন এমন মনে হচ্ছে, তাদেরও অহংকার ও দম্ভ চুরমার করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার তকদীর কাজ করতে শুরু করেছে। এ কাজটি কখন পূর্ণ মাত্রায় হবে তা আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন। যাহোক, তাদের দম্ভ চুরমার হতে শুরু হয়েছে। তাদের মধ্য হতেই তাদের বিরোধী সৃষ্টি হচ্ছে। আমেরিকাতেও বিক্ষোভ হচ্ছে। এখন বিক্ষোভ দমনে, শক্তিপ্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু এ স্ফুলিঙ্গা জ্বলে উঠবে। সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও আবার তা প্রজ্ব লিত হবে।

আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর পরাশক্তিগুলোকে কাণ্ডজ্ঞান দান করুন। নিজেদের জন্য তাদের এক নীতি আর অন্যের জন্য ভিন্ন নীতি। আর এ বিষয়গুলো একসময় গিয়ে জাতিসংঘ ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ হবে।

যে দ্বিতীয় দোয়ার জন্য আজ বলতে চাই, তা আমার নিজের জন্য। আমার অনেক দিন যাবৎ হার্টের ভাল্‌বের সমস্যা ছিল। চিকিৎসকরা ভাল্‌ব প্রতিস্থাপনের কথা বলতেন, কিন্তু আমি তা এড়িয়ে যাই। এখন চিকিৎসকরা বলেন, এমন একটা পর্যায় বিষয় এসে গেছে যে, আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। তাই তাদের অনুরোধে গত কয়েকদিন যাবৎ ভাল্‌ব প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। আর এ কারণে আমি চিকিৎসকদের নির্দেশনা অনুযায়ী কিছুদিন মসজিদেও আসতে পারি নি। আমি আগেই বলেছি, ডাক্তাররা বলেছেন, আল্লাহ্‌র রহমতে চিকিৎসা শাস্ত্রে র দৃষ্টিকোণ থেকে সফলভাবে ভাল্‌ব প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। দোয়া করুন! আল্লাহ্ তা'লা যতটুকু আয়ু দান করেন তা যেন স্বাস্থ্যময় ও কর্মময় হয়, আমীন।

****

জুমআর খুতবা

যদিও মহানবী (সা.)-এর যুদ্ধগুলো বিশ্লেষণ করলে তাঁর (সা.) চমৎকার ও অনন্য যোগ্যতার আশ্চর্যজনক চিত্র ফুটে ওঠে যা একজন সেনাপতি হিসেবে তাঁর (সা.) সত্তায় পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল কিন্তু মহানবী (সা.)-এর একজন সমর বিশেষজ্ঞের মর্যাদা নিয়ে আবির্ভূত হন নি বরং তিনি একজন চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক নেতার পদমর্যাদা রাখতেন যাঁর হাতে উন্নত নৈতিকতার পতাকা তুলে দেওয়া হয়েছিল।

(খুতবাতে তাহের)

তোমরা কী করতে যাচ্ছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি এখনই মুহাম্মদ (সা.)-এর বাহিনীকে হামরাউল আসাদে রেখে এসেছি আর এরূপ ত্রাস সঞ্চারী বাহিনী আমি কখনো দেখিনি। আর উহুদের পরাজয়ের অনুশোচনায় তাদের মাঝে এরূপ উত্তেজনা বিরাজ করছে যে, তোমাদের দেখামাত্রই ভস্মীভূত করে দিবে।

(কুরায়েশ নেতা খাযাআ)

প্রকৃত ঘটনা হলো, সে সময়কার যুদ্ধের রীতিনীতি যদি দেখা হয় তাহলে তদনুযায়ী একথা বলা যায় না যে, উহুদ ময়দানে মুসলমানদের পরাজয় হয়েছিল। এটিকে কীভাবে পরাজয় বলা যেতে পারে অথবা কীভাবে বলা যায় যে কাফেররা বিজয় লাভ করেছে? মুসলমান তো ময়দানে তখনও উপস্থিত ছিল যখন এক পর্যায়ে আবু সুফিয়ান কেবল স্লোগান দিয়ে নিজ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে উহুদ ময়দান ছেড়ে মক্কার দিকে যাত্রা করেছিল।

উহুদের দিনও কোনোভাবেই মুসলমানদের পরাজয় হয় নি। তবে একথা সত্য যে, প্রথম স্ত রে সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের ভয়ানক প্রাণহানির সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু পরিশেষে মুসলমানরা উহুদ প্রান্তরেই ঠাঁয় অবস্থান করে আর মক্কার কাফেরদের পরিপূর্ণরূপে বিজয় অর্জন করার ক্ষেত্রে অদৃশ্য হাত প্রবল শক্তিবলে বাধা দিয়ে রাখে আর এক সাময়িক বিজয় লাভ করা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদেরকে আর কোন ক্ষতি করা থেকে বঞ্চিত থাকে। তৎকালীন যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী উহুদ থেকে তারা বিফল ও ব্যর্থ মনোরথ প্রত্যাবর্তন করে।

মহানবী (সা.) যিনি ইসলামী সমাজের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন এবং যিনি কুরাইশের শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিলেন, তিনি খোদার কৃপায় জীবিত ছিলেন। এছাড়া জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে দু -একজন ছাড়া সবাই নিরাপদ ছিলেন। এছাড়া মুসলমানদের এই পরাজয় এমন এক সৈন্যবাহিনীর বিপরীতে ছিল যাদের সংখ্যা তাদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জামেরে দিক থেকে কয়েকগুণ বেশি শক্তিশালী ছিল।অতএব, মুসলমানদের জন্য বদরের মহান বিজয়ের তুলনায় উহুদের পরাজয় সামান্য একটি বিষয় ছিল। আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরাজয় মুসলমানদের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয়।

সারা বিশ্বের মুসলমান ও ফিলিস্তিনিদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি দোয়ার আহ্বান করে থাকি। যদিও কিছু লোক মনে করে যে, কিছু সময়ের জন্য যুদ্ধবিরতি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বিরাজমান অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয়, যুদ্ধবিরতি হলেও ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্যাতন শেষ হবে না। এজন্য অনেক দোয়ার প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা, ফিলিস্তিনিদের তাঁর দিকে বিনত হওয়ার তৌফিক দিন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত** ৩ মে, ২০২৪, **এর জুমুআর খুতবা (১০ হিজরত ১৪০৩ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, 'গযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ' এর উল্লেখ হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মদীনা এবং হামরাউল আসাদের বৃত্যন্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে যা চয়ন করেছেন তা বর্ণনা করছি।

তিনি (রা.) লিখেন, এই রাত অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের রাত খুবই ভীতিপূর্ণ একটি রাত ছিল। কেননা বাহ্যত কুরাইশ সেনাদল মক্কার পথে যাত্রা করলেও এই আশঙ্কা ছিল যে তাদের এই কাজ মুসলমানদের অসতর্ক করার অভিপ্রায়ে ছিল। আশঙ্কা ছিল যে তারা অকস্মাৎ ফিরে এসে মদীনার ওপর আক্রমণ করে বসবে। তাই এই রাতে মদীনায় পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। আর বিশেষভাবে সাহাবীরা সারারাত মহানবী (সা.)-এর বাড়ি পাহারা দেন। সকালে জানা যায়, এই আশঙ্কা অলীক ছিল না, কেননা ফজরের নামাযের পূর্বে মহানবী (সা.) এই সংবাদ পান যে, কুরাইশ সেনাদল মদীনা থেকে কয়েক মাইল পথ পার হয়ে যাত্রা বিরতি দেয় এবং কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মাঝে এই বিতর্ক চলছে, এই বিজয়ের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মদীনার ওপর কেন আক্রমণ করা হবে না! আর কতিপয় কুরাইশ পরস্পরকে বিদ্রুপ করছিল, তোমরা না মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছ, না মুসলমান মহিলাদের দাসী বানিয়েছ আর না তাদের ধন-সম্পদ করতলগত করেছ, বরং তোমরা যখন তাদের ওপর বিজয়ী হলে এবং তাদেরকে নির্মূল করার সুযোগ লাভ করলে তখন তোমার (কিছু না করে) তাদেরকে এভাবেই ছেড়ে ফিরে গেলে যাতে তারা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। কাজেই, এখনও সুযোগ আছে, ফিরে চলো আর মদীনায় আক্রমণ করে মুসলমানদের মূল উৎপাটন করো। এর বিপরীতে অন্যরা বলছিল, তোমরা একটি বিজয় অর্জন করেছ - একেই বড় প্রাপ্তি জ্ঞান করো এবং ফিরে চলো। পাছে এমন যেন না হয় যে, এই সম্মানও আবার খুইয়ে বসো এবং এই বিজয় পরাজয়ে বদলে যায় । কেননা, এখন যদি তোমরা ফিরে গিয়ে মদীনায় আক্রমণ করো তাহলে নিঃসন্দেহে

মুসলমানরা প্রাণপণ লড়াই করবে আর যারা উহুদে যোগদান করেনি তারাও রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু অবশেষে অত্যুৎসাহী লোকদের মতামত প্রাধান্য লাভ করে আর কুরাইশরা মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মহানবী (সা.) এসব ঘটনা অবগত হওয়া মাত্রই ত্বরিত মুসলমানদের প্রস্তুত হওয়ার জন্য ঘোষণা দেন কিন্তু পাশাপাশি এই নির্দেশও দেন যে, (এই ইতিহাস আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি, কিন্তু এখানে কিছু অতিরিক্ত তথ্য আছে তাই পুনরায় বর্ণনা করছি) যে, উহুদের যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা ছাড়া অন্য কেউ আমাদের সাথে যাবে না। অতএব উহুদের যুদ্ধে যোগদানকারী মুজাহিদগণ, যাদের মধ্যে অধিকাংশই (গুরুতর) আহত ছিলেন, (তারা) নিজেদের ক্ষতস্থান বেঁধে নিজেদের মনিবের সঙ্গে রওয়ানা হন। লেখা রয়েছে যে, এ সময় মুসলমানরা এরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে যাত্রা করেন যেভাবে কোনো বিজয়ী সেনাদল বিজয়ের পর শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়। আট মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে তিনি (সা.) 'হামরাউল আসাদে' পৌঁছেন, যেখানে দুজন মুসলমানের মরদেহ ময়দানে পড়ে থাকতে দেখা যায়। অনুসন্ধানে জানা যায়, তারা সেই গোয়েন্দারা ছিলেন, যাদেরকে মহানবী (সা.) কুরাইশের পেছনে প্রেরণ করেছিলেন, আর সুযোগ পেয়ে কুরাইশরা তাদেরকে হত্যা করেছিল। মহানবী (সা.) একটি কবর খনন করিয়ে এই শহীদদ্বয়কে তাতে একত্রে সমাহিত করেন। আর এ পর্যায়ে যেহেতু সন্ধ্যা নেমে এসেছিল তাই তিনি (সা.) সেখানেই শিবির স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন, ময়দানের বিভিন্ন স্থানে আগুন প্রজ্বলিত করা হোক। অতএব, দেখতে দেখতে হামরাউল আসাদ প্রান্তরে পাঁচশ' অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়, যা দূরবর্তী প্রত্যেক দর্শকের হৃদয়ে ত্রাস সৃষ্টি করতো। সম্ভবত এই সময়েই খুযাআ গোত্রের মা'বাদ নামের এক মুশরিক নেতা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং তাঁর (সা.) কাছে উহুদের নিহতদের সম্পর্কে সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং এরপর নিজের পথ ধরে। পরের দিন সে রওহা নামক স্থানে পৌঁছে সেখানে কুরাইশ বাহিনীকে অবস্থান করতে দেখে যারা মদীনা অভিমুখে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মা'বাদ ত্বরিত আবু সুফিয়ানের কাছে যায় এবং তাকে গিয়ে বলে, তোমরা কী করতে যাচ্ছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি এখনই মুহাম্মদ (সা.)-এর বাহিনীকে হামরাউল আসাদে রেখে এসেছি আর এরূপ ত্রাস সঞ্চারী বাহিনী আমি কখনো দেখিনি। আর উহুদের পরাজয়ের অনুশোচনায় তাদের মাঝে এরূপ উত্তেজনা বিরাজ করছে যে, তোমাদের দেখামাত্রই ভস্মীভূত করে দিবে।

আবু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীদের ওপর মা'বাদের এই কথার এমন প্রভাব পড়ে যে, তারা মদীনা অভিমুখে ফেরত যাবার সংকল্প পরিত্যাগ করে শীঘ্রই মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। মহানবী (সা.) কুরাইশের এভাবে পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ অবগত হলে তিনি (সা.) খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেন, 'এটি খোদা তা'লার প্রতাপ যা তিনি কাফিরদের হৃদয়ে সঞ্চার করে দিয়েছেন।' যেমনটি আমি বলেছি এর বিশদ বিবরণ আমি পূর্বে ও উল্লেখ করেছি, এটি ছিল এর সারমর্ম।

এরপর অর্থাৎ মহানবী (সা.) হামরাউল আসাদে (আরও) দুই-তিন অবস্থান করেন এবং পাঁচ দিন অনুপস্থিতির পর মদীনায় ফেরত আসেন। এই অভিযানে কুরাইশের দু'জন সৈন্য যাদের মাঝে একজন ছিল, বিশ্বাসঘাতক আর অপরজন ছিল গুপ্তচর; (তারা) মুসলমানদের হাতে আটক হয়। যুদ্ধনীতি অনুযায়ী তাদের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড তাই মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে তাদেরকে হত্যা করা হয়। তাদের মাঝে একজন (ছিল), মক্কার বিখ্যাত কবি আবু উয্যা; যে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে আটক হয়েছিল। অতঃপর তার ক্ষমাপ্রার্থনা এবং সে আর কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না মর্মে অঙ্গীকারের পর মহানবী (সা.) কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই তাকে মুক্ত করে দেন। কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতকতা করে পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে আর কেবল সে নিজেই যুদ্ধে যোগ দেয় নি বরং সে তার উসকানিমূলক কবিতার মাধ্যমে অন্যদেরকেও প্ররোচিত করে। যেহেতু এমন মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা মুসলমানদের জন্য চরম ক্ষতির কারণ হতে পারত তাই পুনরায় যখন সে মুসলমানদের হাতে আটক হয় তখন মহানবী (সা.) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। আবু উয্যা আবারও আগের মতো মৌখিক ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমে মুক্তি পেতে চেয়েছিল, কিন্তু মহানবী (সা.) একথা বলতে বলতে (তার) আবেদন নাকচ করে দেন যে, 'লা ইউলদাগুল মু'মিনু মিন জুহরিন ওয়াহিদিন মার্‌রাতাইনি' অর্থাৎ মু'মিন এক গর্তে হতে দু'বার দংশিত হয় না। " (ইবনে হিশাম)

দ্বিতীয় বন্দি ছিল মুয়াবিয়া বিন মুগীরা। সে হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) -র আত্মীয় ছিল, কিন্তু ইসলামের চরম শত্রু ছিল। উহুদের যুদ্ধের পর সে চুপিসারে মদীনার আশেপাশে ঘুরতে থাকলে সাহাবীরা তাকে দেখে ফেলেন এবং ধরে মহানবী (সা.)-এর সামনে নিয়ে আসে। তিনি (সা.) তাকে হযরত উসমান (রা.)-র সুপারিশে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছেড়ে দেন যে, তিন দিনের মধ্যে তাকে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, নতুবা আল্লাহ্‌র কসম! গুপ্তচরবৃত্তির শাস্তি স্বরূপ তাকে হত্যা করা হবে। (মুআবিয়াকে প্রথমে সতর্ক করা হয়েছিল যে, তিন দিনের মধ্যে চলে যাও নতুবা তোমার গুপ্তচরবৃত্তির শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। যদি চলে যাও তাহলে ঠিক আছে, নতুবা ক্ষমা করা হবে না।) মুয়াবিয়া তিন দিনের মধ্যে চলে যাওয়ার অঙ্গীকার করে কিন্তু এই মেয়াদ পার হওয়ার পরও তাকে চুপিসারে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় আর এ কারণে তাকে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এটি বর্ণিত হয়নি যে, তার পরিকল্পনা কী ছিল? কিন্তু এভাবে চুপিসারে মদীনার এলাকায় অবস্থান করা এবং সতর্ক করা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের পরও অবস্থান করা বলে দেয় যে, সে কোনো ভয়ানক দুরভিসন্ধি নিয়ে সেখানে অবস্থান করছিল। আর অসম্ভব নয় যে, উহুদে মহানবী (সা.) এর প্রাণ রক্ষা হওয়ায় সে ক্ষুব্ধ হয়ে মদীনায় মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে এসে থাকবে আর ইহুদী অথবা মদীনার মুনাফেকদের ষড়যন্ত্রে কোন গুপ্ত হামলা করার অভিপ্রায় লালন করবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করেছেন ফলে তার দুরভিসন্ধি কার্য কর হয় নি।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫০৪-৫০৫)

উহুদ যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে অতি দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা রয়েছে। কতক জীবনীকার উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করে। আবার কেউ কেউ এটিকে মুসলমানদের বিজয় বলতে ইতস্তত করে আর এ দুয়ের মধ্যবর্তী দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। যদিও কিছু লোক এমন আছে যারা এক পরাজয়ের পর বিজয় হয়েছে বলে মত প্রকাশ করে থাকে কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, সে সময়কার যুদ্ধের রীতিনীতি যদি দেখা হয় তাহলে তদনুযায়ী একথা বলা যায় না যে, উহুদ ময়দানে মুসলমানদের পরাজয় হয়েছিল। এটিকে কীভাবে পরাজয় বলা যেতে পারে অথবা কীভাবে বলা যায় যে কাফেররা বিজয় লাভ করেছে? মুসলমান তো ময়দানে তখনও উপস্থিত ছিল যখন এক পর্যায়ে আবু সুফিয়ান কেবল স্লোগান দিয়ে নিজ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে উহুদ ময়দান ছেড়ে মক্কার দিকে যাত্রা করেছিল। সেখানে সে এই অন্তঃসারশূন্য স্লোগানও দিয়েছিল যে, আজকের এই দিনটি বদরের দিনের প্রতিশোধ অথচ এটিও কেবল তার স্লোগান-সর্বস্ব কথা ছিল, বদরের প্রতিশোধ কীভাবে হলো? বদরে কাফেরদের সেনাপতিসহ তাদের বড় বড় সর্দার নিহত হয়েছিল আর বদরে তাদের সত্তর জন লোক বন্দী হয়েছিল আর বদরে অজস্র গনিমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। রেওয়ায়েত অনুযায়ী বদরে বিজয়ী মুসলিমরা (যুদ্ধ শেষে) তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করে আর কাফের সেনাদল সেখান থেকে পলায়ন করে, পক্ষান্তরে উহুদের দিন এগুলোর কোনো একটি বিষয়ও কাফেরদের ভাগ্যে জোটে নি, তাহলে এদিনটি কীভাবে বদরের প্রতিশোধ হলো? সুতরাং উহুদের দিনও কোনোভাবেই মুসলমানদের পরাজয় হয় নি। তবে একথা সত্য যে, প্রথম স্তরে সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের ভয়ানক প্রাণহানির সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু পরিশেষে মুসলমানরা উহুদ প্রান্তরেই ঠাঁয় অবস্থান করে আর মক্কার কাফেরদের পরিপূর্ণরূপে বিজয় অর্জন করার ক্ষেত্রে অদৃশ্য হাত প্রবল শক্তিবলে বাধা দিয়ে রাখে আর এক সাময়িক বিজয় লাভ করা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদেরকে আর কোন ক্ষতি করা থেকে বঞ্চিত থাকে। তৎকালীন যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী উহুদ থেকে তারা বিফল ও ব্যর্থ মনোরথ প্রত্যাবর্তন করে। আর যদি এর পরবর্তী দিনই হামরাউল আসাদ অভিমুখে মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবনকে এর সাথে মিলিয়ে দেখা হয় তাহলে উহুদের যুদ্ধ এক দিবালোকের ন্যায় ও সুস্পষ্ট বিজয় হিসেবে প্রতিভাত হয় আর উহুদ ময়দানে পরাজয়ের যে ক্ষণিকের গ্লানি ছিল তা-ও মুসলমানদের জন্য তথা তাদের পরবর্তী যুগের জন্য বহু প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা রেখে গেছে।

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, স্থায়ী ফলাফলের দিক থেকে উহুদ যুদ্ধের বিশেষ কোন গুরুত্বই নেই আর বদরের বিপরীতে এ যুদ্ধ কিছুই নয় কিন্তু সাময়িকভাবে অবশ্যই এ যুদ্ধ কোন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের ক্ষতি করেছে। প্রথমত তাদের তথা মুসলমানদের সত্তরজন লোক এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন যাদের মাঝে কতিপয় জ্যেষ্ঠ সাহাবী ছিলেন আর আহতের সংখ্যা তো ছিল অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত মদীনার ইহুদী এবং মুনাফিকের যারা বদরের যুদ্ধের ফলাফলে কিছুটা ভয়ে ছিল, তারা কিছুটা ধৃষ্ট হয়ে উঠে বরং আব্দুল্লাহ বিন উবাই এবং তার সাঙ্গপাঙ্গারা তো প্রকাশ্যে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করল এবং কটূক্তি করল। তৃতীয়ত মক্কার কুরায়েশরা খুব সাহসী হয়ে উঠলো আর তারা মনে মনে ভাবলো, আমরা কেবল বদরের প্রতিশোধই গ্রহণ করি নি বরং আগামীতেও যখন দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করব, তখন মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হব। চতুর্থত আরবের অন্যান্য গোত্রগুলোও উহুদের পর আরো ধৃষ্টতার সাথে মাথা চাড়া দিতে লাগলো। কিন্তু এতসব ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও ধ্রুব সত্য হলো, বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, উহুদের বিজয়ের পক্ষে সে ঘাটতি

পূরণ করা সম্ভব ছিল না। বদরের যুদ্ধে মক্কার সেই সকল নেতা যারা প্রকৃতপক্ষে কুরাইশ জাতির প্রাণভোমরা ছিল তারা সবাই নিহত হয়েছিল। যেভাবে পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে, প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধে এ জাতির মূল কেটে দেওয়া হয়েছিল। আর এই সব অসাধ্য এমন এক জাতির হাতে হয়েছে যারা বাহ্যিক উপকরণের দৃষ্টিকোণে তাদের তুলনায় অত্যন্ত তুচ্ছ ছিল। তাদের তুলনায় নিঃসন্দেহে উহুদের প্রান্তরে মুসলমানরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু তা তাদের সে ক্ষতির তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য ও যৎসামান্য ছিল যা তাদের বদরের প্রান্তরে কুরায়েশের হয়েছিল।

মহানবী (সা.) যিনি ইসলামী সমাজের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন এবং যিনি কুরাইশের শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিলেন, তিনি খোদার কৃপায় জীবিত ছিলেন। এছাড়া জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে দু -একজন ছাড়া সবাই নিরাপদ ছিলেন। এছাড়া মুসলমানদের এই পরাজয় এমন এক সৈন্যবাহিনীর বিপরীতে ছিল যাদের সংখ্যা তাদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জামেরে দিক থেকে কয়েকগুণ বেশি শক্তিশালী ছিল।অতএব, মুসলমানদের জন্য বদরের মহান বিজয়ের তুলনায় উহুদের পরাজয় সামান্য একটি বিষয় ছিল। আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরাজয় মুসলমানদের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয়। কেননা এর মাধ্যমে তাদের কাছে এই কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, মহানবী (সা.)-এর ইচ্ছা ও নির্দেশনার পরিপন্থী পদক্ষেপ নেওয়া কখনো কল্যাণের কারণ হতে পারে না।

তিনি (সা.) মদীনায় অবস্থানের মতামত দেন, এর বিপরীতে নিজের একটি স্বপ্নও শোনান কিন্তু লোকেরা মদীনা থেকে বাইরে এসে যুদ্ধ করার ওপর জোর দেয়। মহানবী (সা.) তাদেরকে উহুদের এক গিরিপথে নিযুক্ত করে তাকিদ পূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যা -ই হোক, তোমরা এই স্থান ছেড়ে যাবে না। কিন্তু তারা গনিমতের সম্পদের চিন্তায় সেই জায়গা ছেড়ে নিচে নেমে আসেন। যদিও এই দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল ছোট একটি দলের পক্ষ থেকে। কিন্তু যেহেতু ইসলামী সমাজ সবাইকে একটি মালার ন্যায় গেঁথে রাখে তাই সেই দুর্বলতার ফলে ক্ষতির সম্মুখীন সবাই হয়েছিল। একইভাবে যদি লাভবান হতো তাহলে সবাই লাভবান হতো। অতএব এটিও একটি নীতিগত বিষয়। কখনও কখনও কয়েকজনের দুর্বলতার কারণে পুরো সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একইভাবে লাভের ক্ষেত্রে পুরো সমাজে এক ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। এখন আমরা পৃথিবীতে দেখি, আহমদীয়া জামাতের পক্ষে অনেক মানুষ কথা বলে। যদিও শতভাগ আহমদী উচ্চমার্গের বা উচ্চমানের নয়। কিন্তু কিছু এমন আছেন যাদের ভালো প্রভাব রয়েছে যে কারণে অন্যদেরও মানুষ উন্নত মানের বলে মনে করে।

"অতএব উহুদের পরাজয় যদি এক দৃষ্টিকোণ থেকে কষ্টের কারণ হয়ে থাকে তাহলে অন্যদিকে এটি মুসলমানদের জন্য একটি কল্যাণকর শিক্ষায় পরিণত হয়েছিল। কষ্টের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি মুসলমানদের পথে কেবল সাময়িক একটি প্র তিবন্ধকতা ছিল। এরপরে মুসলমানরা সেই মহাপ্লাবণের ন্যায় যা কোনো বাধায় আরো তীব্র হয় অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫০৬-৫০৭)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) উহুদের যুদ্ধোত্তর ঘটনাবলীর বিশ্লেষণাত্মক বক্তৃতা দিয়েছেন। সেই বক্তৃতার কিছু দফা হলো : প্রথমত, মুসলমানদের মাঝে থেকে পরাজয়ের গ্লানি পুরোপুরি দূর করার জন্য এর থেকে আর ভালো কোনো পদক্ষেপ হতে পারতো না যে, তাদেরকে অনতিবিলম্বে নতুনভাবে যুদ্ধের জন্য রণক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া।

দ্বিতীয়ত, উহুদে অংশ নেয়নি এমন যুবক ও যোদ্ধাদের সাথে যাবার অনুমতি না দিয়ে মহানবী (সা.) নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি (সা.) বাহ্যিক উপকরণের ওপর নির্ভর করতেন না। বরং নিজের সেই দাবি ও বিশ্বাসে অটল ছিলেন যে, তিনি সত্যিকার অর্থে নিজ প্রভুর ওপর নির্ভর করতেন। আর তিনি তাকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান।

তৃতীয়ত, এই সিদ্ধান্তে র মাধ্যমে মহানবী (সা.) সেসব সাহাবীর মনস্তুষ্টি করেন উহুদের ময়দানে যাদের পদস্খলন ঘটেছিল এবং তাদের সামনে পরিপূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেন যে, তারা প্রকৃত অর্থে পিছু হটার মানুষ ছিলেন না, বরং হঠাৎ তারা অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়েছিলেন।

.....মানব ইতিহাসে যুদ্ধের এমন একটিও দৃষ্টান্ত নেই যেখানে কোনো সেনাপতি তার সৈন্যদের প্রতি এতটা আস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন যখন কি-না সেই সৈন্যরাই কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তাঁকে একা ফেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এমনভাবে পলায়ন করেছিল যে, গুটিকতক জানবাজ ব্যক্তি ছাড়া তাঁর পাশে আর কেউ ছিল না।

চতুর্থত, মহানবী (সা.)-এর এই ভরসা করা শতভাগ সঠিক ছিল আর তা কোনো আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত ছিল না- একথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিনা ব্যতিক্রমে উহুদের সেসকল মুজাহিদ পূর্ণ দৃঢ়চিত্ততা ও প্রেরণা নিয়ে চরম ভয়ংকর এই যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগ দেন যাদের মাঝে হাঁটার শক্তি ছিল না। আর একজন ব্যক্তিও একথা বলে মুখ ফিরিয়ে নেন নি যে, এ অভিযান তো আত্মহত্যার নামান্তর এবং এ প্রশ্নও করেন নি যে, একবার বড় কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে বের হওয়ার পর আবার সেই শক্তিশালী ও অত্যাচারী শত্রুর ফাঁদে নিজে নিজে ধরা দেওয়া কোথাকার বুদ্ধিমত্তা? উহুদের দ্বিতীয় দিনেই মহানবী (সা.)-এর শত্রুদের পিছু ধাওয়ায় বের হওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁর সাহাবীদের প্রতি এত বড়ো একটি অনুগ্রহ ছিল- যা কোনো সেনাপতি তার সেনাবাহিনীর প্রতি প্রদর্শন করে নি অর্থাৎ তাদের প্রশ্নবিদ্ধ আচরণের নিমিষে কামিল সূরাহা করেছেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

পঞ্চমত, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে প্রমাণিত যে, মহানবী (সা.)-এর এই পদক্ষেপ কেবল মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক কল্যাণ নিজের মাঝে রাখতো না বরং সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তা অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল আর এর ফলে শত্রুরা আরেকটি ভয়ংকর আক্রমণ করা থেকে বিরত রইল, বরং এমনভাবে ফিরে গেল যে, বিজয় লাভের পরিবর্তে মারাত্মকভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। কোনো অতিরিক্ত ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন না হয়ে মহানবী (সা.) কেবল নিজের প্র জ্ঞা ও সুপরিকল্পনার কল্যাণে সুমহান বহু কল্যাণরাজি লাভ করেন। তিনি (রাহে.) লিখেন, যদিও মহানবী (সা.)-এর যুদ্ধগুলো বিশ্লে ষণ করলে তাঁর (সা.) চমৎকার ও অনন্য যোগ্যতার আশ্চর্যজনক চিত্র ফুটে ওঠে যা একজন সেনাপতি হিসেবে তাঁর (সা.) সত্তায় পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল কিন্তু মহানবী (সা.)-এর একজন সমর বিশেষজ্ঞের মর্যাদা নিয়ে আবির্ভূত হন নি বরং তিনি একজন চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক নেতার পদমর্যাদা রাখতেন যাঁর হাতে উন্নত নৈতিকতার পতাকা তুলে দেওয়া হয়েছিল।

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উত্তম চরিত্রের পতাকা সমুন্নত রাখা এবং উড্ডীন করার পর যে মহান জিহাদে তিনি (সা.) রত ছিলেন তা এমন এক নিরবচ্ছিন্ন ও অনন্ত সংগ্রাম ছিল যা শান্তির যুগেও অবিকল সেভাবে বিদ্যমান ছিল যেমনটি ছিল যুদ্ধের অবস্থায়। দিনের বেলায় তিনি (সা.) এ পতাকার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং রাতের বেলায়ও। শত্রুরা অসংখ্যবার তাঁকে (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের প্রচণ্ড শারীরিক আঘাতে জর্জরিত এবং যন্ত্রণাদায়ক আঘাত হানতে সক্ষম হয় কিন্তু উন্নত চরিত্রের এই পতাকায় কখনো তিনি (সা.) সামান্যতম আঁচ লাগতে দেন নি এবং এটিকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেন নি। এতৎসত্ত্বেও তাঁর (সা.) যে উন্নত চরিত্র ছিল তা সর্বদা দৃশ্যমান ছিল। সেই সময়েও এ পতাকা তাঁর (সা.) পবিত্র হাতে অত্যন্ত মহিমার সাথে গগনচুম্বী ছিল যখন তাঁর (সা.) শরীর প্র চণ্ড আঘাতে জর্জরিত ও নিস্তেজ হয়ে উহুদের সেই কঙ্করময় ভূমিতে পতিত হচ্ছিল। সেই সময়েও এ পতাকা এক অভাবনীয় ভ্রুক্ষেহীনতায় তাঁর (সা.) হাতে উড্ডীন ছিল যখন চারদিকে সাহাবীদের দেহ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ভূপাতিত হচ্ছিল। অতএব উহুদের যুদ্ধে মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সেসব সাথি সাহাবীদের চারিত্রিক জিহাদ যারা তাঁর সঙ্গী ছিল- একইসাথে অত্যন্ত জোরালো ভাবে অব্যাহত থাকে এবং মহান বিজয়ী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি চারিত্রিক যুদ্ধে মহান বিজয় লাভ করেন। তিনি (সা.) এসব ভয়ানক ভূমিকম্পের মাঝ থেকে নিরাপদে বেরিয়ে এসেছেন যা নৈতিক চরিত্রের অত্যন্ত শক্তিশালী ভবনগুলিকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

(খুতবাতে তাহের, খিলাফতের পূর্বের, পৃ: ৩৩১-৩৩৫)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, 'উহুদের যুদ্ধে যদিও বিজয়ের পর পরাজয়ের দিক সামনে আসে তথাপি এ যুদ্ধ সত্যিকার অর্থে মহানবী (সা.)-এর সত্যবাদীতার এক অনেক বড়ো নিদর্শন। রসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ যুদ্ধে, প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের বিজয় লাভ হয়। এরপর রসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর (সা.) প্রিয় চাচা এ যুদ্ধে শহীদ হন। রসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যুদ্ধের প্রারম্ভে কাফেরদের পতাকাবাহী নিহত হয়। এরপর রসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি নিজে আহত হন এবং অনেক সাহাবী শহীদ হন। এছাড়া মুসলমানদের এমন নিষ্ঠা ও দৃঢ় ঈমানের স্বাক্ষর রাখার সুযোগ হয় যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় কোথাও পাওয়া যায় না।'

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৫৩)

উহুদের যুদ্ধ এক বড়ো বিজয় ছিল। এ যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) কীভাবে তা'লীম ও তরবীয়তের কাজ পুনরায় শুরু করেন এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, "এ যুদ্ধে যদিও অনেক মুসলমান শহীদ হন এবং অনেকেই আহত হন, তবুও একে পরাজয় বলা যায় না। এ এক বিরাট বিজয় ছিল। এমন বিজয় ছিল যে, কিয়ামতকাল পর্যন্ত মুসলমানরা এ ঘটনাকে স্মরণ করে নিজেদের ঈমান বৃদ্ধি করতে পারে এবং বৃদ্ধি করতে থাকবে। মদীনা পৌঁছানোর পর মহানবী (সা.) মূল কাজ অর্থাৎ তালীম,

এরপর ৬ পাতায়....

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মানী সফর, ২০২৩

মসজিদ নাসের (Waiblingen) এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.) এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: সকল সম্মানীয় অতিথিবর্গ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই যিনি এই এলাকায় মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণ করার তৌফিক দান করেছেন, যেখানে তারা একত্রিত হয়ে ঠিকমত ইবাদত করতে পারবে। কেবল ইবাদতই নয়, বরং আরও অনেক কাজের জন্য পরিল্পনা করতে পারবে এবং সেগুলোর উপর আমল করার চেষ্টা করতে পারবে, যেগুলো সমাজ, প্রতিবেশী এবং নিজেদের উন্নতির জন্য জরুরী। আমি এই এলাকার মেয়র, কাউন্সিলর ও প্রতিবেশীদেরকেও ধন্যবাদ জানাই যারা এই মসজিদটি নির্মাণে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে। আমাদের এই মসজিদ কেবল পুরুষদের জন্য নয়, বরং মহিলারাও এর জন্য আনন্দিত। মসজিদে নামায হওয়ার পর আমি মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলাম। সেখানে এক ভদ্রমহিলা আমাকে বলেন, আমরা দীর্ঘ দিন দোয়া করছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকেও একটা ঘর দান করেন, আমি আপনাকে দোয়ার জন্যও লিখতাম। আজ আমরা মসজিদ পেয়ে ভীষণ আনন্দিত। এখানে আমরা সকলে একত্রিত হতে পারব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মসজিদ সেই স্থান যেখানে মহিলা, পুরুষ ও শিশুরা একত্রিত হয় এবং এমন সব অনুষ্ঠান হয় যা তাদের তরবীয়তের জন্য ভাল। সেগুলি কেবল তাদের ধর্মীয় শিক্ষাই দেয় না, বরং জাগতিক শিক্ষার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাদেরকে বলা হয় যে, কিভাবে দেশীয় আইন-কানুন মেনে চলতে হবে, কিভাবে একজন আদর্শ নাগরিক হতে হবে। তাদের বলা হয়, প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাল আচরণ করতে হবে। মসজিদে আসা ব্যক্তিদের ইবাদতের পাশাপাশি তরবীয়ত হিসেবে এই বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমীর সাহেব বলেছেন, এখানকার জামাত অনেক জনসেবামূলক কাজ করেছে স্থানীয় লোকেরা সেগুলির প্রশংসাও করেছে। এই সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজগুলি এমন বিষয় যার দ্বারা প্রকৃত মানবতার মূল্যায়ন করা যায়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এটি ধনী দেশ। এখানে ততটা অভাব নেই। কিন্তু তবু যেখানে প্রয়োজন আছে জামাত আহমদীয়া জনকল্যাণমূলক কাজ করার পুরো চেষ্টা করে। কিন্তু আফ্রিকায় যে সমস্ত অভাবপীড়িত দেশ রয়েছে, তৃতীয় বিশ্বের দেশ রয়েছে, সেখানে জামাত আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি স্কুলও নির্মাণ করে, হাসপাতালও নির্মাণ করে। আদর্শ গ্রামও গড়ে তোলে আর জল সরবরাহেরও ব্যবস্থা করে, অনাথাশ্রমও তৈরী কের। এই সমস্ত জনকল্যাণমূলক কাজ জামাত সমগ্র বিশ্বে করে আসছে আর এগুলো আমরা জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য করে থাকি। আমি এর পূর্বেও অনেক বার বলেছি, এখানেও বলে দিচ্ছি যে, আমাদের অধিকাংশ জনকল্যাণমূলক কাজ, স্কুল, হাসপাতাল এবং সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কেবল আহমদীরাই লাভবান হয় না,বরং এর থেকে লাভবান হওয়া সত্তর শতাংশ মানুষ এমন যারা আহমদী নয়, এমনকি তারা মুসলমানও নয়। তাদের মধ্যে অনেকে আছে খৃষ্টান, কেউ আবার নাস্তিক বা অন্যান্য ধর্মের অনুসারী যারা এই সব প্রকল্পগুলি থেকে উপকৃত হয়। অতএব, এই সেবামূলক কাজগুলিই আমাদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করে আর এগুলি অবশ্যই আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার অংশ। আল্লাহ্ তা'লা জনকল্যাণমূলক কাজ করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা যদি বান্দার অধিকার প্রদান না কর তবে তোমাদের নামায যা তোমরা আমার ইবাদতের জন্য মসজিদে এসে পড়ে থাক, সেগুলি তোমাদের মুখে ছুড়ে মারা হবে। বান্দাদের অধিকার প্রদান কর, তারপর আমার কাছে এস। তবেই আমি তোমাদের দোয়াও শুনব আর তোমাদেরকে এর প্রতিদানও দিব। সুতরাং আমরা এই শিক্ষার উপরই আমল করি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমীর সাহেব একথার উল্লেখ করেছেন যে, লর্ড মেয়র সাহেব জমি কেনা থেকে মসজিদ নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক সাহায্য করেছেন। আমি তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই। তিনি ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। ইন্টিগ্রেশন এর স্টেট সেক্রেটারী সাহেবও এখানে এসে কিছু কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, পৃথিবীতে অনেক সমস্যা। তাঁর এই কথাটি আমার ভাল লেগেছে যে, এই সমস্ত সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পেতে ধর্ম আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করে। বর্তমান যুগের মানুষ আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ নিয়ে চার্চও অভিযোগ করছে, মসজিদও অভিযোগ করেছে আর অন্যান্য ধমের মানুষও অভিযোগ করছে যে, মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আর নিজেদের স্রষ্টাকে ভুলে যাচ্ছে। আর এই কারণেই অনেক সমস্যার উৎপত্তি হচ্ছে। পৃথিবীতে বিভিন্ন মহামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অন্যান্য সমস্যাবলীর মূল কারণ হল আমরা একথা ভুলে বসেছি যে, আমরা আদম সন্তান এবং সেই খোদার সৃষ্টি যিনি সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম, জাতি ও গোষ্ঠী তাদেরকে কেবল পৃথকভাবে চেনার জন্য। কুরআন করীমে লেখা আছে যে, এই বিভিন্ন জাতি,বর্ণ ও গোষ্ঠী তোমাদের সনাক্তকরণের জন্য পৃথক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তোমরা এক জাতি অর্থাৎ মানবজাতি। অতএব মানুষ হিসেবে নিজের গুরুত্ব অনুধাবন কর। আমরা যখন নিজেদের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হব তখন অনেকগুলি সমস্যার সমাধান নিজে থেকেই হয়ে যাবে। কোভিড তো একটা মহামারি। মহামারি আসে, দুর্যোগ আসে (এগুলি প্রাকৃতিক) কিন্তু আমরা অনেকগুলি সমস্যা নিজেরাই সৃষ্টি করেছি যার ফলে সারা বিশ্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে আছে। এর একমাত্র কারণ, যেমনটি এই মাত্র উল্লেখ করেছি, আমরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যাচ্ছি, আমরা ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমরা যদি এই সত্যকে অনুধাবন করতে পারি এবং ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করি তবে দেখব, ইসলাম, খৃষ্টবাদ, ইহুদীধর্ম, হিন্দু বা অন্য কোন ধর্ম এমন নেই যে অপরের অধিকার আত্মসাৎ করার এবং পৃথিবীতে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার শিক্ষা দেয়। প্রত্যেক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ভালবাসা ও সম্প্রীতির শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। সেই শিক্ষাকেই আমাদের অবলম্বন করা প্রয়োজন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যাইহোক ইসলাম আমাদের এটাই শিক্ষা দেয় যে, বান্দার অধিকার প্রদান করা তোমাদের কর্তব্য। যেমনটি আমি প্রথমেই বলেছি, যদি বান্দার অধিকার প্রদান না কর, অভাবীদের সাহায্য না কর, অনাথদের প্রতি সদয় না হও, মিসকীনদের প্রতি যত্নবান না হও তবে তোমাদের ইবাদত ও মসজিদে আসা কোন কাজে আসবে না। এটাই আমাদের চিন্তাধারা আর এই চিন্তধারা নিয়েই আমরা কাজ করি্ অনুরূপভাবে প্রাদেশিক পার্লামেন্টে সদস্যও এখানে এসেছেন। তিনিও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। এই কারণে আমি তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই। দেশের আইন মেনে চলার কথা তিনি বলেছেন। এটা মৌলিক বিষয়। ইসলাম দেশীয় আইনের প্রতি নিয়মানুবর্তিতার উপদেশ দেয়। ইসলাম আমাদের আদেশ দিয়েছে- আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আদেশের পর প্রশাসনের আদেশও পালন কর। কেননা তারা তোমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছে। তাই যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে, সেখানে এই দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে আগের থেকে বেশি যত্নবান হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়, দেশের প্রতি ভালবাসা তোমাদের ঈমানের অঙ্গ। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকেও দেশের আইন মেনে চলা আমাদের কর্তব্য, শুধু তাই নয়, বরং প্রশাসকদের কথাও মেনে চলা উচিত। সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করুন। এই বিষয়গুলিই বিশৃঙ্খলা রোধ করতে পারে। পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ বজায় রাখতে পারে এবং শান্তি বজায় রাখতে পারে। যদি এটা না থাকে তবে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? সেই ভদ্রমহিলা শিক্ষার বিষয়েও কথা বলেছেন। এরজন্যও আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের রসুল হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.) শিক্ষার গুরুত্বের বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন-একজন মানুষকে দোলনা থেকে মৃত্যুশয্যা পর্যন্ত শিক্ষার্জন করতে থাকা উচিত। (অর্থাৎ শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত) নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে থাকা উচিত। আর এই শিক্ষা তথা জ্ঞানই তোমাদের মস্তিষ্ককে আলোকিত করবে, তোমাদের চিন্তাধারাকে উদার করবে এবং তোমাদেরকে উচ্চ নৈতিকতা সৃষ্টির তৌফিক দান করবে। এর দ্বারা তখন তোমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ সৃষ্টি কর এবং চেষ্টা কর। মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে অনেক সময় সংশয় থাকে যে, ইসলাম হয়তো মেয়েদের অধিকার খর্ব করে। হযরত মুহম্মদ (সা) বলেছেন, মেয়েদেরকে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত কর। বরং তিনি এর জন্য এতটা গুরুত্বারোপ করেছেন যে, তিনি বলেছেন, যার তিনজন কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদেরকে সুশিক্ষিত করে তোলে এবং তাদেরকে সমাজের কল্যাণকর সত্তায়

পরিণত করে, তাদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ করে দেয়, এমন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। এটাই হল মহিলাদের মর্যাদা যা ইসলাম তাদেরকে দান করেছে। ইসলাম মতে, এভাবে শিক্ষা অর্জন করলে এবং বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিলে তোমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মও সুরক্ষিত থাকবে। এমনটি হলে নিশ্চয় তাকে সুশিক্ষা দানকারী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। বরং যে সব শিশুদেরকে সেই মহিলা শিক্ষা দান করবে, তারাও ইহকাল ও পরকালের উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেনন: জেলা প্রতিনিধি যে বক্তব্য রেখেছেন, তার জন্য আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি। তিনি আমাদের এদেশে স্থান দিয়েছেন, আমাদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছেন, এরজন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। এখানে পাকিস্তান থেকে আসা অধিকাংশই এমন পরিস্থিতিতে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে যাদের কোন ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এখানে এসে যখন তারা ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করেছে, তখন এর থেকে বড় বিষয় আর কি হতে পারে? এখন সে নিজের ধর্মানুসারে খোদার ইবাদত করতে পারবে আর মানুষকে বলতে পারবে যে, আমরা এক খোদার ইবাদতকারী আর এই আমাদের শিক্ষা। শহরের মেয়র সাহেবও নিজের উচ্চ মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, এটা যেন একটা স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার মত বিষয়।অবশ্যই এটা জামাতে আহমদীয়ার জন্য স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার মত। যেমনটি আমি শুরুতেই উল্লেখ করেছি, সেই ভদ্রমহিলা আমাকে আজকেই বলেছে যে, আমাদের একটা স্বপ্ন ছিল যা আজ পূর্ণ হয়েছে। আজ আমরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে ইবাদতের জন্য একত্রিত হয়েছি। অনুরূপভাবে আমরা নিজেদের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিও এখানে করব। যাইহোক মেয়র সাহেবও একথাই বলেছেন যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। সরকার যদি ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয় তবে তাতে শান্তির প্রসার ঘটবে এবং সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন:ইসলাম আমাদেরকে প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদানের শিক্ষা দেয়। মসজিদ তৈরী হয়ে গেছে। কিছু প্রতিবেশীর মনে হয়তো সংশয়ও থাকতে পারে। আজও সেখানে অনেক মানুষ একত্রিত হয়েছিল। অনেক নারা ধ্বনি উচ্চকিত হচ্ছিল। কিছু মানুষ হয়তো বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু প্রতিবেশীদের অধিকার প্রসঙ্গে ইসলাম শিক্ষা দেয়, চল্লিশটি বাড়ি পর্যন্ত তোমাদের প্রতিবেশী আর তাদের অধিকার তোমাদের প্রদান করতে হবে। ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.) প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদানের বিষয়ে এতটা গুরুত্বারোপ করেছেন যে, সাহাবাদের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, হয়তো প্রতিবেশীদেরকে উত্তরাধিকারও দেওয়া হবে, এমন আদেশ যেন আবার না আসে। প্রতিবেশীর সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে যে, বাড়ির আশ পাশের চল্লিশটি বাড়ি তোমাদের প্রতিবেশী। এছাড়া তোমাদের সফরসঙ্গী তথা সহযাত্রীরাও তোমাদের প্রতিবেশী। অফিসের সহকর্মীরাও তোমাদের প্রতিবেশী, পথে যাদের সঙ্গে তোমাদের নিত্যদিন সাক্ষাত হয়, তারাও তোমাদের প্রতিবেশী। অতএব, প্রতিবেশীদের ন্যায় তাদের অধিকার দেওয়ার চেষ্টা কর। এভাবে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, প্রতিবেশী হিসেবে প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর। এমনটি করলে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। এটাই যখন যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন দেশের উন্নতি তরান্বিত হয়। এগুলি কেবল তোমাদের ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য নয়, বরং সমষ্টিগতভাবে দেশ এর ফলে উন্নতি করে। এটাই আমাদের চিন্তাধারা আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সর্বত্র জামাত আহমদীয়ার বিষয়ে মানুষকে অবহিত করে থাকি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি আশা করি, এখন এই মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর আহমদীরা নিজেদের মনোভাব, আচার আচরণ, নৈতিকতা এবং শিক্ষাদীক্ষাকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করবে- এই সমাজ, পরিবেশ এবং শহরের মানুষের সামনে এবং প্রতিবেশীদের সামনে- যাতে তারা জানতে পারে যে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ভালবাসা, শান্তি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষা দেয়। এই সেই শিক্ষা যার মাধ্যমে একদিকে যেমন আমরা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানকারী হতে পারি, তেমনি অপরদিকে এর উপর আমল করে বান্দার অধিকারও প্রদানকারী হয়ে উঠতে পারি। এখানে বসবাসকারী সকল আহমদীকে আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দান করুন যে, তারা এবং আপনারা যেন শান্তি ও সৌহার্দের এক প্রতীক হয়ে ওঠেন। এই প্রার্থনা দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

এলিসার হাসানি একজন আরব অতিথি। হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণ শেষে অবলীলায় বলে ওঠেন, 'খলীফা সেই সব কথা বর্ণনা করেছেন যা নবী করীম (সা.) ওসীয়্যত করেছিলেন।' নিজের আবেগ অনুভূতির কথা জানিয়ে তিনি বলেন- খলীফার ভাষণ আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। কেননা খলীফা কেবল সেই সব কথাই বর্ণনা করেছেন যা স্বয়ং নবী করীম (সা.) বর্ণনা করেছিলেন। আমার জন্য তো ইসলাম একটাই। মুসলমানদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয় আর আজ এখানে আহমদীদের মাঝে আমাকে খুব ভাল লাগছে। আমার আন্তরিক বাসনা, আরও মানুষ ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হোক।

খলীফার ভাষণের মধ্যে সব থেকে জরুরী যে বিষয়টি আমার মনে হয়েছে আর খলীফা যে বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন, সেটি হল- শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সকলের সংগ্রাম করা উচিত। খলীফার কথাগুলি আমার হৃদয়ে কিভাবে রেখাপাত করেছে তা কিভাবে বর্ণনা করব তা বুঝে উঠতে পারছি না।

ইরভিন উইল্যান্ড নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন- ইসলাম আহমদীয়াতের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এখানে এসে আমাকে খুব ভাল লেগেছে। আজ ইসলামের বিষয়ে আমার ধারণা পুরো পাল্টে গিয়েছে। খলীফার ভাষণা খুব সুন্দর ছিল। কেননা, তিনি সময়োপযোগী ভাষণ দান করেছেন এবং সব সমস্যাবলী নিয়ে কথা বলেছে যেগুলির আমরা সম্মুখীন হচ্ছি আর তাঁর ভাষণে সেগুলির সমাধানও রয়েছে। খলীফার ভাষণে আমার যে বিষয়টি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে সেটি এই যে, আমাদের সকলের একসঙ্গে মিলে মিশে থাকা উচিত। আমি একথা জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, আপনারা মহিলাদেরকেও প্রত্যেকটি কাজে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি দেন আর মসজিদেও মহিলাদেরকে স্থান দেন। কেননা আমার মনে হত যে, আপনারা মহিলাদেরকে সব কিছুর বাইরে রাখেন। খলীফা একজন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, যিনি সরল ও সত্য কথা বলেন।

ডক্টর পিটার জার সহকারি জেলা শাসক। তিনি মঞ্চে ভাষণও দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, খলীফার ভাষণ আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। খলীফার মধ্যে এক বিশেষ আকর্ষণীয় শক্তি রয়েছে। তাঁকে দেখামাত্রই একটা অনুভূতি কাজ করে যে, তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যদিও আমি আপনাদের জামাতের সদস্য নই, কিন্তু খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করা আমার জন্য গর্ব ও সম্মানের বিষয়। তিনি মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে অত্যন্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। আর এমন ধারণ জন্মানোর কারণ হল, তিনি নিজের ভাষণে পূর্বের বক্তাদের বক্তব্যগুলিকে যুক্ত করেছেন। তিনি উৎকৃষ্ট অথচ সহজবোধ্য ভাষায় নিজের ভাষণ উপস্থাপন করেছেন, যে কারণে তাঁর কথাগুলো বোঝা সহজ ছিল। এই প্রথম মুসলমানদের কোন সভায় তাদের সমস্ত কথা ও শিক্ষা অনুধাবন করার সুযোগ হল।

কার্ল বি একজন প্রোটেস্ট্যান্ট পাদ্রী। তিনি বলেন, এর আগে আমি জামাত আহমদীয়ার বিষয়ে পরিচিত ছিলাম না। কিন্তু আজ থেকে আমার জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক শুরু হল। খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করে খুব ভাল লাগল। তাঁর ভাষণ আমার পছন্দ হয়েছে। কেননা তাঁর ভাষণে বিষয়ের গভীরতা ব্যাপক ছিল আর তিনি নিজের পূর্বের বক্তাদের কথাগুলিকেও নিজের ভাষণের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। এই জিনিসটা আমার খুব ভাল লেগেছে। তাঁর ভাষণ খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের জন্যও জরুরী। কেননা এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত হয়। যদিও আমি একজন খৃষ্টান, তবুও খলীফার ভাষণে সম্মানিত বোধ করছি। মহিলাদের অধিকার বিষয়ক কথাগুলি আমার পছন্দ হয়েছে আর আমি আশা করি, এই শিক্ষা অনুশীলিতও হচ্ছে।

পেট্রা হ্যাফনার একজন প্রাদেশিক সাংসদ। তিনি বলেন, খলীফা সঙ্গে সাক্ষাত করা এক বিশেষ অভিজ্ঞতা আর এটি এমন এক সম্মান যা প্রতিদিন লাভ হয় না। আমি দেখে আশ্চর্য হয়েছি যে তাঁর আগমণে ও আকর্ষণে পুরো হলঘর মানুষের সমাগমে উপচে পড়েছে। কিন্তু তার থেকেও বেশি প্রভাবিত হয়েছি খলীফার ভাষণ শুনে। যদি খলীফার ভাষণে বর্ণিত শিক্ষা যথাযথ অনুশীলন করা যায় তবে সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

খলীফা যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন,তখন আমার কাছে লেখার জন্য আমার বক্তব্যের কাগজটি ছাড়া কোন কাগজ ছিল না। বাধ্য হয়ে আমি সেটিতেই খলীফার ভাষণের মধ্য থেকে কিছু কিছু কথা লিখে নিই। এখন আমার মনে হচ্ছে, সেই কথাগুলি এমন অসাধারণ যে, বড় হরফে ছাপিয়ে রাখা উচিত। যেমন তিনি কুরআন করীমের শিক্ষা বর্ণনা করে বলেছেন, মানুষের বর্ণ, জাতি ও গোষ্ঠীর তারতম্য রয়েছে তাদের সনাক্তকরণের জন্য। কিম্বা সেই হাদীসটি যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তিন কন্যা সন্তানকে সুশিক্ষিত করে তোলে,সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি মনে করি, এই কথাগুলি সারা

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 6 June, 2024 Issue No.23

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

বিশ্বে প্রচারিত হওয়া উচিত আর সমস্ত ধর্মের ভিত্তি এরই উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তাঁর ভাষণের আরও একটি কথা যেটা আমার ভাল লেগেছে সেটা এই যে, আমরা তখনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারব যখন সম্মিলিতভাবে এর জন্য চেষ্টাও করব। অন্যথায় এটি সম্ভব নয়।

ক্রিস্টিয়ান বার্জম্যান একজন সমাজ সেবী। তিনি বলেন, আমি খলীফা ভাষণ ও ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়েছি। তাঁর ভাষণ দীর্ঘ ছিল না। আর তিনি আমাদের বিষয়ে বলেন নি,বরং আমাদের জন্য ভাষণ দিয়েছেন। তিনি অনেক খোলাখুলি কথা বলেছেন এবং নিজের ভাষণে পূর্বের বক্তাদের কথাগুলিকেও নিজের ভাষণে স্থান দিয়েছেন। ইসলামের শিক্ষানুসারে একজন মুসলমানের জন্য তার প্রতিবেশীর গণ্ডি চল্লিশটি বাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত। একজন সমাজ সেবী হিসেবে এই বিষয়টি আমাকে অভিভূত করেছে। খলীফাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি না আর পূর্বেও কখনও সাক্ষাত হয় নি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে মনে হয় তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর সঙ্গে মানুষ জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারে এবং অনেক কিছু শিখতে পারে। এটা খুব ভাল।

চার্চের প্রতিনিধি হিসেবে এক অতিথি এসেছিলেন। তিনি বলেন, এখানে আমার কারোর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। আমি এমনিই এই সভায় অংশগ্রহণ করেছিলাম যে দেখি সমাবেশটি কেমন। এখন খলীফার ভাষণ শুনে অনেক প্রভাবিত হয়েছি। তাঁর বলা কথাগুলি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। বিশেষ করে তিনি বার শিক্ষার্জনের উপর জোর দিয়েছেন এবং মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্বকেও স্পষ্ট করেছেন। আমি খৃষ্টানদেরকেও এই বার্তা পৌঁছে দিব। খলীফা তাঁর মান্যকারীদের নসীহত করেছেন যে, পরস্পর মিলেমিশে থাকা উচিত আর এমনভাবে থাকা উচিত যাতে জার্মানীতে আরও বেশি একতা সৃষ্টি হয়। খলীফা যা কিছু তাঁর ভাষণে বলেছেন, চার্চের প্রতিনিধি হিসেবে সেগুলির সঙ্গে আমি একমত।

কাতিয়া মুলার একজন স্থানীয় রাজনীতিক। তিনি বলেন, আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য আর খলীফার সঙ্গে সাক্ষাতের সম্মান দেওয়ার জন্য আমি ভীষণ আনন্দিত। খলীফা জামাতের যে শিক্ষামালা তুলে ধরেছেন, আমি মনে করি, সেগুলিকে প্রদর্শনীর রূপ দিয়ে প্রকাশিত করা উচিত। খলীফা বলেছেন, আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সমষ্টিগতভাবেও শান্তি ও সৌহার্দ্যতার সঙ্গে একত্রে থাকা উচিত। অনুরূপভাবে খলীফা মহিলাদের অধিকার প্রসঙ্গে যা কিছু বলেছেন সেগুলোও আমার ভাল লেগেছে।

ক্লাউস ইউরগেনস নামে একজন অতিথি বলেন, আমি ও আমার স্ত্রী খলীফার ভাষণ শুনে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি। কেননা খলীফার কথায় এক সতেজতা অনুভব করেছি। আমি তাঁর ভাষণ দানের পদ্ধতি দেখেও প্রভাবিত। কেননা তিনি পূর্বের বক্তাদের ভাষণগুলিকে মনোযোগ সহকারে শুনেছেন, এমনকি সেগুলিকে নিজের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে স্থান দিয়েছেন। এর থেকে খলীফার গভীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। খলীফা কেবল জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে কেবল বর্ণনাই করেন নি, বরং মানুষকে সেই সব বিষয়ের প্রতি আমল করানোর প্রতিও আহ্বান করেছেন। তিনি মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে যে শিক্ষা বর্ণনা করেছেন তা শুনে আমি আশ্চর্য হয়েছি। কেননা, এর পূর্বে এ বিষয়ে আমার যে ধারণা ছিল তা সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি বলেছেন, নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা উচিত আর পরস্পরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করা উচিত। এই বিষয়গুলি আমার জন্য ব্যক্তিগতভাবেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, যাবতীয় উচ্চ নৈতিকতা ও সদাচরণ কোন মানুষের উদ্ভাবন নয় বরং মানুষ এগুলি শিখেছে ধর্মের মাধ্যমে।

বেনেডিকট পলোউটস স্থানীয় মেয়র। তিনি মঞ্চে এসে বক্তব্যও রেখেছেন। তিনি বলেন, খলীফার আগমণ আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের বিষয়। খলীফাকে দেখে এমন এক ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয় যিনি যুগের প্রয়োজনীয়তাকে সনাক্ত করতে পারেনএবং মানুষের প্রকৃত চাহিদার বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখেন। বিশেষ করে অভাবী মানুষদের বিষয়ে। আমি মনে করি, মানুষ, ধর্ম ও জাতিসমূহের মাঝে সম্পর্কের সেতুবন্ধন রচনা করা এবং বিশ্বকে উন্নতির পথে পরিচালিত করা খলীফার ন্যায় ব্যক্তিত্বের জন্য সম্ভব। তিনি মেয়েদের শিক্ষার বিষয়েও কথা বলেছেন এবং এর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করেছেন। এটা কেবল মুসলমানদের জন্য নয়, বরং

আজ চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, সর্বপ্রথম শিশুর কান কাজ করা শুরু করে এবং এরপর চোখ কাজ করে করতে শুরু করে এবং সব শেষে চিন্তা শক্তি কাজ করতে শুরু করে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহল এর ৭২ নং আয়াত

وَاللّٰهُ اَخۡرَجَكُمۡ مِّنۡۢ بُطُوۡنِ اُمَّهٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ شَيۡـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمۡعَ وَالۡاَبۡصَارَ وَالۡاَفۡـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ

এর ব্যাখ্যায় বলেন: হে মানবজাতি! তোমরা মাতৃগর্ভে থাকাকালীন কিছুই জানতে জানতে না, সেই অবস্থা থেকে আমরা তোমাদেরকে চোখ, কান এবং হৃদপিণ্ড সহকারে পৃথিবীতে পাঠিয়েছি যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। কিন্তু তোমরা আমার এই দানকে কোনও কাজে লাগালে না। চোখ দিয়ে দেখলে না, কান দিয়ে শুনলে না আর হৃদয় দিয়ে ভেবেও দেখলে না। এই বাক্যটি কেমন দয়া ও আক্ষেপে পরিপূর্ণ! বান্দাদেরকে এই উদাসীনতা তাদেরকে শাস্তিযোগ্য করে তুলেছে, কিন্তু সর্বশক্তিমান খোদা তাদের এই উদাসীনতাকে কিরূপ স্নেহপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করছেন।

সূরার বিষয়বস্তুর এই আয়াতটির সম্পর্ক হল এতে ঐশী ইলহামের প্রয়োজনীয়তার আও একটি প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। মানুষ যখন ভূমিষ্ঠ হয়,তখন কোনও কিছুই তার জানা থাকে না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাকে চোখ, কান এবং হৃদয় সহকারে সৃষ্টি করেন যাতে সে এগুলির সাহায্যে শিখতে পারে। কাজেই গতানুগতিক যে শিক্ষা মানুষ লাভ করে সেগুলি সবই খোদা প্রদত্ত উপকরণের মাধ্যমেই শেখা হয়। কোনও মানুষ একথা বলতে পারবে না যে, খোদা-প্রদত্ত উপকরণগুলির প্রয়োজন তার নেই আর সে নিজে থেকেই জ্ঞানার্জনের উপকরণ সৃষ্টি করতে পারবে। তবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের জন্য খোদা তা'লা যে সব উপায় উপকরণ সৃষ্টি করেন সেগুলির ব্যবহার করতে অস্বীকার করা হয় কেন?

আশ্চর্যের বিষয় হল মানুষের সকল শ্রেষ্ঠত্ব সেই উপকরণ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে যা তাকে প্রকৃতি দান করে থাকে। মানুষ যে সমস্ত উৎকর্ষ অর্জন করতে পেরেছে তা সবই এই সব শক্তিবৃত্তির সাহায্যে। আর এই শক্তিবৃত্তিগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে কোনও সংকোচ করে না। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক উপায় উপকরণের প্রশ্ন আসে,তখন সে বলে, 'আমার এসবের প্রয়োজন কি? আমি নিজেই নিজের কাজ করতে পারি। অথচ যেভাবে তার জাগতিক উন্নতির জন্য খোদা প্রদত্ত উপকরনের প্রয়োজন রয়েছে অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক ঔৎকর্ষ অর্জনের জন্য সেই সব উপকরণের প্রয়োজন যা আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় পূর্ণ প্রজ্ঞা দ্বারা তার জন্য সৃষ্টি করেন।

আয়াতের শেষে তিনি বলেছেন, এই সব বস্তু দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের মধ্যে যেন আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির মূল্যায়ন হয়। এর বিপরীতে তোমরা এই সব শক্তিগুলি নিয়ে গর্বিত হয়ে পড় আর দাবি কর যে তোমাদের কোনও বাহ্যিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

এই আয়াতে কানের পর চোখ এবং চোখের পর হৃদয়ের উল্লেখ করা হয়েছে আর ক্রমানুসারে এই অঙ্গগুলিই মানুষের জ্ঞানার্জনের কারণ হয়। শিশুর কানদুটিই সর্ব প্রথম কাজ করে। তার পর চোখ এবং এই দুটির পর অন্তর বা চিন্তাশক্তি কাজ করে। আজ চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, সর্বপ্রথম শিশুর কান কাজ করা শুরু করে এবং এরপর চোখ কাজ করে করতে শুরু করে এবং সব শেষে চিন্তা শক্তি কাজ করতে শুরু করে। তাই দেখা যায় জীবজন্তুদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কয়েকদিন পর তাদের বাচ্চাদের চোখ ফোটে। এই সময় শুধু তাদের কান কাজ করে। মানব শিশুর চোখ বাহ্যত ফুটে গেছে বলে মনে হলেও সেগুলি কাজ করতে শুরু করে কান কাজ করতে শুরু করার পরেই। আর চিন্তাশক্তি অনেক পরে কাজ করতে শুরু করে। এই পর্যায়ক্রমটিও প্রমাণ করে যে কুরআন করীম ঐশী বাণী। কেননা, এতে সেই রহস্য উন্মোচিত হয়েছে যা সেই যুগে লুক্কায়িত ছিল।

বস্তুত, নবুয়্যতের যুগ থেকে যখন কোনও জাতি দূরে চলে যায় তখন সেই জাতির অধিকারসমূহ মুষ্টিমেয় পরিবারের উত্তরাধিকার হিসেবে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। আর জনসাধারণকে জাগতিক কিম্বা ধর্মীয় কোনও বিষয়েই পরামর্শ দেওয়ার যোগ্য মনে করা হয় না। আর এই পার্থক্যটিকে এক মিথ্যা যোগ্যতার পরিণাম বলে ধরা হয়। এক বাদশহার আহম্মক সন্তানকে পৃথিবীর সব থেকে বুদ্ধিমান মানুষ বলে গণ্য করা হয়। আর সেই নির্বোধ নিজে এতটাই গর্বিত থাকে যে, যখন সে পৃথিবীর সামনে নিজের কোনও নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ঘোষণা করে তখন সেই ঘোষণার মধ্যে বিভিন্ন অসংলগ্ন শব্দ ব্যবহার করে।

অনুরূপ অবস্থা ধর্মীয় জগতেরও। উলেমাদের পুত্ররা অর্ধেক জ্ঞান রাখে আর নিজেদের ভাবনাশক্তি থেকে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু তাদেরকে মাশায়েখ এইজন্য বলা হয় যে তারা উলেমাদের সন্তান। আর তারা চায় লোকে বিনা প্রশ্নে তাদের অজ্ঞতাপূর্ণ কথাবার্তা মেনে নিক। আর যে- তাদের সামনে খোদা তা'লার বাণী উপস্থাপন করে, সেই সব অবাস্তব কল্পকাহিনী এবং অর্থহীন বর্ণনা, যেগুলির কোনও প্রমাণ তাদের কাছে থাকে না, অস্বীকার করার দরুণ তারা তাকে কাফের ও মুরতাদ আখ্যায়িত করে বসে।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir